পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

দক্ষিণবঙ্গের কৃষকের ভাষায়, কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতিতে রয়েছে নানা মাত্রা। বিগত পঞ্চাশ বছরে এখানে কৃষিক্ষেত্রে, কৃষকের জীবনাচরণে, সর্বোপরি কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ-সংগঠনে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রঙ বদল হয়েছে কৃষি-ভাষা-সংস্কৃতির। একটা সময় পর্যন্ত কৃষকরা প্রয়োজনীয় জলের জন্য কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতো। অনাবৃষ্টির দিনে তারা আর্তকণ্ঠে জানাতো তাদের আকুতি—''আল্লা মেঘ দে পানি দে মাঠে ময়দানে/ তোমার বান্দা জলে গেলো পানির আবানে।'' এখন কৃত্রিম জলসেচ এর প্রবর্তন হয়েছে। স্যালো মেশিন সহযোগে অনায়াসে তাবৎ জমিকে জলময় করা কৃষকদের ভাষায় ভিজানো যাচ্ছে—''ভিজানোতেই বিগেয় দুশো করে পড়ে গেল তা আর কি হবে?'' বৃষ্টি হলে সব জমি একই সময়ে সমানভাবে ভিজে যায়। কৃত্রিম ভাবে জলসেচে তা হয় না। ক্রমান্বয়ে এক একটি জমিকে ভেজাতে হয়। সেক্ষেত্রে আল কাটানোর প্রশ্ন আসে। একটা জমি সম্পূর্ণভাবে জলসিক্ত হলে অতঃপর তার একদিকের আল কেটে দেওয়া হয়। জল ওই কর্তিত পথে নিচের জমিতে নেমে যায়। কৃত্রিম জলসেচ প্রচলিত হওয়ার আগে কৃষকদের কাছে আল কাটানো কথাটির কোনো অর্থ ছিল না। ''বসবিতো বেতে কাটবি, উঠবিতো ছেলে ধরবি''—একটা সময় কৃষক পরিবারে কথাটি প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো উচ্চারিত হত। এখন আর এর তেমন চল নেই। বেতে কাটা তখন সম্পন্ন কৃষক মাত্রের আবশ্যিক কাজ ছিল। কোনো না কোনো কাজে সবসময়ই দড়ির দরকার হয়। এখনকার মতো তখন বাজারে পাটের বা নাইলনের দড়ি কিনতে পাওয়া যেত না। পাটের সুতা তৈরি করে তাই দিয়ে দড়ি বানানো হতো। পাট থেকে সুতা তৈরির যে প্রক্রিয়া তার নাম বেতে কাটা। কৃষকরা একটু অবসর সময় পেলেই বেতে কাটতে বসতো। বেতে কাটা এখন শুধুই স্মৃতি, কথার কথা। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা এমনিভাবে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি ভাষা-সংস্কৃতিতে সময়ের পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনা করবো।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দক্ষিণবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী কৃষিকাজের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিল। মানুষের উপার্জনের মাধ্যম ছিল খুবই কম। শহর ও গ্রামের পারস্পারিক যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যমের প্রসার এসব না থাকার কারণে গ্রাম্য সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতির পারস্পারিক আদান প্রদান ছিল না। গ্রামের মানুষ বিশেষ

কাজ ছাড়া শহরে যেত না। শহুরে মানুষও গ্রাম্য সমাজ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করত। সেদিনের দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে শিক্ষার প্রসারও ছিল খুব কম। কৃষক পরিবারের মানুষ বংশ পরম্পরায় চাষবাসের সঙ্গেই যুক্ত থাকতো। গ্রাম থেকে অল্প কিছু মানুষ যারা শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পেত তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করতে শুরু করতো। ফলে ঐ মানুষদের দিয়ে গ্রামের কোনো উপকার হত না। গ্রাম তার নিজস্ব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে টিকে ছিল।

গত কুড়ি তিরিশ বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের প্রভাবে উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম এসেছে। ঘুচে গিয়েছে গ্রাম ও শহরের দুস্তর ব্যবধান। এখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত গ্রাম থেকেও প্রতিদিন বহু মানুষ কলকাতায় কাজ করতে আসছে। সারাদিন কাজ করে এরা আবার সন্ধ্যায় ফিরে যাচ্ছে গ্রামে। আবার বহু মানুষ কলকাতায় থেকে কাজ করছে। তারা সপ্তায় বা মাসে বাড়ি যাচ্ছে। জীবনের অনেকটা সময় শহরে কাটানোর কারণে শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে তারা পরিচিত হচ্ছে এবং সেই অভিজ্ঞতা তারা ভাগ করছে গ্রামের অন্যদের সঙ্গে। শহরে কাজ করা বা শহুরে পরিবেশে সময় কাটানোর ফলে এইসব মানুষদের জীবনাচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিতে আসছে অমূল পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়ছে অন্যদের উপর।

গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট প্রভৃতির প্রভাবে বদলে গিয়েছে গ্রাম বাংলার কৃষকরা। এখন কৃষিশ্রমিকরা সারাদিন কাজ করার পর বিকালে মোবাইল নিয়ে facebook,Whatsapp,you tube প্রভৃতি নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। যা গত দশ বছর আগে ভাবাই যেত না। এর পাশাপাশি গত দশ পনেরো বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কৃষক পরিবারের সন্তানরা স্কুল কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে। কৃষক পরিবারের এই সন্তানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর আর কৃষিকাজের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে না। তারা উন্নত জীবন যাপনের আশায় সরকারি চাকুরি বা অন্যান্য কাজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশে। এইভাবে উদ্ভব হচ্ছে এক আধুনিক প্রজন্মের। এই সবকিছুর মিলিত প্রভাবে বদলে যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতি। এখন আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই বদলবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করবো। এক্ষেত্রে কৃষি প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে

ভাগ করে অতঃপর দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাক্য, বাক্যবন্ধ ও শব্দকে একক হিসাবে গ্রহণ করে তার পর্যালোচনা করা হবে।

কৃষি প্রক্রিয়া

লাঙল বেচে সংসার চালানোর দিন আজ আর নেই

একটা সময় পর্যন্ত লাঙল-গরু কৃষিক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে এর গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গিয়েছে। এখন লাঙল গরুর পরিবর্তে ট্রাক্টরের প্রচলন হয়েছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে একসঙ্গে অনেক জমি চাষ করা যাচ্ছে, খরচও তুলনায় কম হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যিকিকরণ এখন পরিচিত বিষয়। এমন দিনে লাঙল-গরু আর মানানসই নয়। এতে খরচা অনেক বেশি। কম খরচে বেশি উৎপাদন পেতে সব স্তরের চাষিরাই তাই ট্রাকটরের সাহায্য নিচ্ছে। যাদের অর্থ আছে, যারা যথেষ্ট সম্পন্ন চাষি তারা নিজেরোই ট্রাক্টর কিনে নিচ্ছে, অন্যেরা ভাড়ার ট্রাক্টর ব্যবহার করছে। পরিবর্তিত এই অবস্থার ছায়াপাত লক্ষ করা যাচ্ছে কৃষক সমাজের সমাজভাষায়—খোল জাবনা দিয়ে গরু পোষার দিন আজ আর নি; লাঙল এবার আড়ায় তুলে রাখতি হবে, এমন কথা প্রায়শ শোনা যায় দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে। ট্রাক্টরের ব্যবহার বাড়ার কারণে কৃষি সংস্কৃতি যেমন উপকৃত হয়েছে তেমনই কাজ হারিয়েছে বহু মানুষ। “ লাঙল বেচে সংসার চালানোর দিন আজ আর নেই ” কথাটির মধ্যে যেমন বিকল্প জীবিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনই কৃষি সংস্কৃতির এক বিশাল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির ঘোষণাও শুনতে পাওয়া যায়।

গোলা ওঠার দিন খুব খাওয়া দাওয়া হত তখন

কিছু দিন আগে পর্যন্ত ‘গোলা’ ছিলো কৃষি সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় সব জেলার সম্পন্ন কৃষকের ঘরে গোলা থাকতো। গোলায় ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি দানাশস্য সংরক্ষণ করতো কৃষকরা। বর্তমানে অধিকাংশ কৃষক পরিবারে গোলা আর দেখতেই পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়ায় গোলার এখনও কিছু প্রচলন আছে। কলকাতা সংলগ্ন উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতিতে গোলা বিলুপ্ত প্রায় বিষয়। গোলার ঐতিহ্য বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কারণ বিদ্যমান। ফসল সংরক্ষণ হল গোলার মূল কার্যকারিতার দিক। একাজের জন্য এখন অনেক আধুনিক উপায় প্রচলিত হয়েছে। ফলে

কৃষককে আর বাড়ির কিছুটা জায়গা আটকে গোলা তৈরি করে রাখতে হয় না। দক্ষিণবঙ্গের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও এজন্য কিছুটা দায়ী। একটা সময় এখানকার অধিকাংশ জমি ছিল এক ফসলি। বছরে একবার ধান চাষ করে সেই ধান সারাবছরের খোরাক হিসাবে সংরক্ষণ করতে হত। এক্ষেত্রে কৃষকদের বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশ জমি বহু ফসলি। ফলে সারা বছর ধানের অভাব নেই। ধান দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণেরও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বর্তমানে ধান থেকে চাল তৈরি করা শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। তাই এখন অনেক কৃষক পরিবার চাষের ধান বিক্রি করে বাজার থেকে চাল কিনে খায়। যা কিছু পুরানো গোলা আজও রয়ে গেছে সম্পন্ন কৃষক পরিবারে তার অধিকাংশ এখন বছরের অর্ধেক সময় খালি পড়ে থাকে। বাড়ির মেয়েরা তাতে হাঁস মুরগি প্রতিপালন করে। নতুন করে আর গোলা তৈরি করা হয় না। গোলা কমে যাওয়ার কারণে 'গোলা ওঠা ' কথাটির ব্যবহারও আজ আর প্রায় নেই। অথচ একটা সময় 'গোলা ওঠা' বিষয়টি কৃষক সমাজে প্রায় উৎসবের আকারে পালিত হত।

যে দিন জমির ধান গোলায় তোলার কাজ শেষ হত সেই দিন কৃষকের বাড়িতে সমস্ত শ্রমিকদের অর্থাৎ ওই কৃষকের বাড়িতে নির্দিষ্ট মরশুমে যারা কাজ করেছে তাদের নিমন্ত্রণ থাকত। শ্রমিকদের ভালো ভালো খাবার খাইয়ে সন্তুষ্ট করত কৃষক-কর্তা। তৈরি হত এক আনন্দঘন পরিবেশ। বর্তমান কৃষি সংস্কৃতিতে গোলা ওঠাকে কেন্দ্র করে কোনো উৎসবের অস্তিত্ব নেই। এখনকার কৃষি শ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট । তারা মালিকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রত্যাশা করে না। বর্তমান দিনে কৃষি মজুরদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অতীতের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে বেশ সুখকর। কিন্তু তখন গোলা ওঠা বা ঠাকুর ওঠার দিন কৃষক এবং মজুরদের মধ্যে যে হৃদ্যতা তৈরি তা আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিবর্তিত কৃষি সংস্কৃতি সার্বিক বিচারে ইতিবাচক হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা বাঙালি জীবনকে যান্ত্রিক করে দিয়েছে।

তিন ঘন্টা ছেউতি টানা লোক আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি প্রক্রিয়ায় 'ছেউতি'র ব্যবহার একটা সময় প্রচুর ছিল। জমিতে জলসেচ করার কাজে ব্যবহৃত হত ছেউতি। বর্তমানে ছেউতির ব্যবহার খুব কমে এসেছে। এর কারণ কৃষি প্রক্রিয়ার বিবর্তন। স্যালো, ডিপ টিউব ওয়েল, সাবমার্সিবেল, জল তোলা মেশিন প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ার পূর্বে কৃষকরা

জলসেচের বিষয়ে খুব দড় ছিল না। পুকুর, নদী বা খাল থেকে ছেউতির সাহায্যে জমিতে কমবেশি জলসেচের চেষ্টা করতো তারা। কোনো সন্দেহ নেই, ছেউতিতে করে জলসেচ করার বিষয়টি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। সেদিন লোকে বাধ্য হয়ে এই কষ্টাসাধ্য কাজই করতো। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা ছেউতি করে জলসেচ করে যেতে পারতো। এখন জসসেচের আধুনিক ও অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কাজেই কৃষকরা আর কষ্টসাধ্য কাজ করতে চাইছে না। অনভ্যাসের কারণে বিষয়টিতে তারা আর কোনোভাবেই অভ্যস্ত থাকতে পারছে না। কেউ ইচ্ছা করে যদি বা ছেউতি হাতে তুলে নেয়, বেশিক্ষণ এ কাজে স্থায়ী হতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উদ্ধৃত বাক্যবন্ধে এই সত্যেরই ইঙ্গিত আছে। উল্লেখ্য, ছেউতিতে জলসেচের বিষয়টি এইরকম—ছেউতির দুই দিকে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। দুই জন লোক দুই দিকে দাঁড়িয়ে ওই দড়ি ধরে ছেউতিটিকে জলে নামায় এবং ছেউতি ভর্তি জল শারীরিক শক্তি বলে উপরে তুলে আনে। এরপর তা নালার মধ্যে ঢেলে দেয়। নালা দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে জমিতে পৌঁছোয়।

আলোচ্য বাক্যবন্ধ থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। কৃষিক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে কৃষকরা শারীরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি সক্ষম ছিলো। অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্র কৃষি সংস্কৃতিকে উন্নত করেছে, কিন্তু কৃষকদের শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছে।

আল্লা মেঘ দে পানি দে মাঠে ময়দানে।

যখন কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, যখন কৃষকরা কৃষিকাজের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকতো। দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত না হলে গ্রামের বিশেষত মুসলমান পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয় থেকে জল তুলে কোনো পীরের থান বা ওই জাতীয় কোনো স্থানে ঢালত। সাতটা বা তারও বেশি পুকুর থেকে এই জল নিয়ে আসা হত। পাত্রভর্তি জল মাথায় করে নিয়ে আসার সময় ছেলেমেয়েরা ছড়ার মতো করে সুর সহযোগে উদ্ধৃত বাক্যবন্ধটি উচ্চারণ করতো—“আল্লা মেঘ দে পানি দে মাঠে ময়দানে/তোমার বান্দা জ্বলে গেল পানির আবানে।” সাধারণের বিশ্বাস ছিল এমন করে প্রার্থনা করলে সত্যিই বৃষ্টিপাত হবে। এখন আর এই দৃশ্য বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও অনাবৃষ্টির সমস্যা কমবেশি রয়েছেই। কৃত্রিম জলসেচের সুবিধা থাকায় প্রকৃতির উপর

নির্ভরশীলতা কমেছে। তাই কৃষকদের মানসিক অবস্থাতেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে।

ক্যারি করা না কি সব বলে, ওসব আমরা কখনো শুনিনি

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি থেকে অনেক অনুষঙ্গ যেমন হারিয়ে গিয়েছে তেমন অনেক নতুন অনুষঙ্গ প্রচলিত হয়েছে। 'ক্যারি করা' তেমনই একটি বিষয়। পটল চাষের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ছোটো ছোটো পলিথিনের ব্যাগে পটল গাছের নতি বসানো হয়। তাতে জল ও সার দিয়ে বিশেষ যত্ন নিলে ছোটো ছোটো পটল চারা তৈরি হয়। পটল চারা ঠিকঠাক তৈরি হলে পলিথিনের ব্যাগ ছিঁড়ে মাটি সমেত চারা জমিতে বসানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি চারা থেকে উপযুক্ত পটল গাছ তৈরি হয়।

এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে পটলের নতি সরাসরি জমিতে বসানো হত। এতে কিছু নতি থেকে গাছ হত কিছু মারা যেত। ক্ষতিগ্রস্ত হত পটলচাষ। সেদিনের কৃষকরা এই ক্ষতি মেনে নিত। কারণ বাজার অর্থনীতি তখন আজকের মত এত জোরদার হয়নি। বাজারের চাহিদাও এত বেশি ছিল না। ফলে যে পরিমাণ পটল উৎপাদিত হত তাতেই খুশি থাকত সেদিনের কৃষক সমাজ। কিন্তু বর্তমানে বাজার চাহিদা প্রচুর। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কৃষকরা কৃষি পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে। এখন কৃষকরা চাষে উৎপাদনের বিষয়ে খুব সচেতন। পটলচাষ করে যদি সব জমিতে পটলের চারা ঠিকঠাক না হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমান কৃষকরা এই ক্ষতি মেনে নিতে রাজি নয়। তাই তারা আবিষ্কার করেছে ক্যারি করা পদ্ধতি। উপকৃত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজ। কৃষি-সংস্কৃতিতে পড়ছে এর প্রভাব।

ফুল ঠেকানোতে হেলা করিস না কিন্তু

ফুল ঠেকানো পদ্ধতিটিও এযুগের। পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমরা পূর্বের অধ্যায়ে অলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখব, এই পদ্ধতি আবিষ্কারের কারণ কী। প্রথম কারণ অবশ্যই বাজার চাহিদা। দিনে দিনে বাজার চাহিদা বাড়ছে। ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলে চাহিদার সঙ্গে যোগানের সঙ্গতি থাকে না। তাই ফুল ঠোকানো পদ্ধতি এযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা পটলের পরাগ মিলনের জন্য প্রকৃতির

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতো। সেদিনের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নির্ভরতা বৃথা যেত না। তাই কৃত্রিম উপায়ে পরাগ মিলনের দরকার বোধ করেন নি তাঁরা। কিন্তু এযুগের কৃষকদের প্রকৃতির উপর সেই নির্ভরতা নেই। এর কারণ সীমাহীন পরিবেশ দূষণের ফলে প্রকৃতিতে কীট পতঙ্গের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। পূর্বে যে পরিমাণে মৌমাছি, প্রজাপতি, ফড়িং, ঝিঁঝি পোকা দেখা যেত এখন আর ততটা দেখতে পাওয়া যায় না। পরাগ মিলনের প্রাকৃতিক কারিগর এরাই। তাই এদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় প্রাকৃতিক উপায়ে যথাযথ পরাগ মিলনের সম্ভাবনা কমে গিয়েছে। বিকল্প মাধ্যম অবলম্বন করা ছাড়া বর্তমান কৃষকদের কোনো উপায় নেই। এই পদ্ধতি পটল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছে একথা সত্য। তবে এর ফলে কৃষক পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন কাজের পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে। পটল চাষের সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় জমি থেকে উপযুক্ত পুং লিঙ্গ ফুল সংগ্রহ করে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরের দিন ভোরে সেই জল প্রতিটা স্ত্রী লিঙ্গ ফুলে ড্রপারে করে এক বা দুই ফোটা দিতে হয় বা পুরুষ ফুল নিয়ে প্রতিটা স্ত্রী ফুলে স্পর্শ করাতে হয়। হাজার ব্যস্ততা থাকলেও কৃষকরা কোনোদিন সকালে এই কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। তেমন হলে চাষে ক্ষতি হতে বাধ্য। তাই উদ্ধৃত সতর্ক বাক্যের উচ্চারণ।

আণ্ডার গাউন এ ধস নেমে তখন কতরকম বিপদ হত

কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য ডিপটিউব ওয়েল, মিনি টিউব ওয়েল বা সাবমার্সিবেল আবিষ্কারের পূর্বে দমকলের মাধ্যমে মাটির নীচ থেকে জল তোলা হত। গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ জলতল নেমে গেলে দমকল মাটির উপরে রেখে জল তোলা যেত না। সেক্ষেত্রে মাটিতে পনেরো কুড়ি ফুট গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দমকল নামিয়ে জল তুলতে হত। এই গর্তকে বলা হত আণ্ডার গাউন। সেই সময় দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে এই ধরনের গর্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যেত।

ডিপটিউব ওয়েল, মিনি টিউব ওয়েল, বা সাবমার্সিবেল আবিষ্কারের ফলে এখন সেচ ব্যবস্থা আমূল বদলে গিয়েছে। এইসব মাধ্যম দ্বারা ভূগর্ভের বহু নীচের জলও মাটির উপর তুলে আনা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সারা বছর জলের যোগানে আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এখনপুরানো দমকলের ব্যবহার কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে আণ্ডার গাউন কথাটিও।

এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা। এখানকার কৃষিক্ষেত্রে ডিপ টিউব ওয়েল,

মিনিটিউব ওয়েল বা সাবমার্সিবেল এর ব্যবহার খুব কম। এর মূল কারণ জেলা দুটিতে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ খুব কম। মূলত পাথুরে এলাকা হওয়ায় এখানে ভৌম জলের পরিমাণ কম। বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত বাঁশি সমবায় সমিতির অফিসে আমরা দেখেছি তিনটি বড় বড় ডিপ টিউবওয়েল এর মোটর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে আমরা জানতে পেরেছি ঐ মোটর গুলি বসানোর পরিকল্পনা হলে এলাকাবাসি তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের দাবি ঐরকম বড় মোটর দিয়ে সারাবছর মাটির নীচ থেকে জল তুললে গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়া জেলার কোনো মানুষ খাওয়ার জলও পাবে না। বিষয়টি কিয়দংশে সত্য। এই রকম নানা কারণে বাঁকুড়া , পুরুলিয়া জেলায় ডিপটিউব ওয়েল বা মিনিডিপ টিউব ওয়েলের ব্যবহার খুব কম। ফলে সেখানকার কৃষকরা আজও দমকল, হণ্ডা মেশিন প্রভৃতির সাহায্যে জলসেচ করে। মূলত নদী বা জলাশয় থেকে মেশিনের সাহায্যে জলসেচের পরিমাণ বেশি। স্যালো মেশিনের ধারণা সেখানে নেই। ফলে আণ্ডার গাউন কথাটিরও অস্তিত্ব নেই। ধস নামা কথার সঙ্গে পরিচিত সকল বাঙালি, কিন্তু আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ধস নামা বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত নয় অনেকেই। তাছাড়া বর্তমান দিনে যেভাবে অণ্ডার গ্রাউণ্ডের ঐতিহ্য কমতে শুরু করেছে তাতে আর কিছুকাল পরে অনুষঙ্গটি দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাবে।

ট্রাক্টর এসে লাঙল উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।

ট্রাক্টর এর মূল কার্যকারিতা জমিতে চাষ দেওয়া। ট্রাক্টর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার একটি অন্যতম মাধ্যম। ট্রাক্টর আবিষ্কারের পূর্বে কৃষকদের একমাত্র অবলম্বন ছিল লাঙল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে দিনে দিনে কৃষি জমির পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। একসঙ্গে প্রচুর জমিতে চাষ করার প্রয়োজন পড়ছে। এখনকার এই দ্রুত গতির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লাঙল দিয়ে চাষ করা অসম্ভব। এখন কম সময়ে অনেক বেশি জমিতে চাষ করতে হয়। ট্রাক্টর এ কারণেই কৃষিক্ষেত্রের অপরিহার্য অঙ্গ।

লাঙল দিয়ে চাষে করতে হলে যে পরিমাণ শ্রমিক এর প্রয়োজন বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে সেই পরিমাণ শ্রমিক পাওয়া যায় না। বহু বিকল্প জীবিকা তৈরি হওয়ায় বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের বড্ড অভাব। আবার লাঙল দিয়ে জমি চাষ করতে হলে দুটো উপযুক্ত এঁড়ে গরুর দরকার। এদিকে সেই গরুর

যোগানও বর্তমানে নেই। বাড়িতে গরু প্রতিপালন করা বর্তমান দিনে বেশ ঝামেলার কাজ। গরু দেখাশুনা করার জন্য সবসময় একজন লোক দরকার। এযুগের নিউক্লিয়ার পরিবারে এত লোক নেই। ফলে এযুগের কৃষকরা লাঙলের উদ্দেশ্যে গরু পালন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ট্রাক্টরের মত সুবিধাজনক উপায় সহজলভ্য হওয়ায় লাঙলের উদ্দেশ্যে গরু পালনের ঝামেলা এযুগের কৃষকরা নিতে চায় না। ফলে কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ব্যবহার কমে গিয়েছে। এতে হারিয়ে যাচ্ছে লাঙল সংশ্লিষ্ট অনেক কথা। যেমন সায়া গরু, আঁকড়া, লাঙল বওয়া ইত্যাদি।

ঠোঙার পেয়ারা, রঙ দেখলেই খেতি ইচ্ছে হবে।

বিশেষ করে পেয়ারা চাষে কথাটি ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেয়ারা চাষ শুরু হওয়ার আগে কথাটির ব্যবহার ছিল না। পেয়ারার বাজার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে কৃষকরা পেয়ারা চাষে সচেতন হয়। মসৃণ ও সুন্দর রঙের পেয়ারার বাজার মূল্য অনেক বেশি। পেয়ারার উপর সূর্যের আলো যদি সরাসরি পড়ে তবে রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। কিন্তু হালকা সবুজ রঙের পেয়ারার বাজার মূল্য সবচেয়ে বেশি। এ কারণে কৃষকরা পেয়ারার গায়ে খবরের কাগজ জড়িয়ে দেয়। ফলে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে পেয়ারা রক্ষা পায়।

গাঢ় সবুজ রঙের পেয়ারা অপেক্ষা হালকা সবুজ রঙের পেয়ারার খাদ্যগুণ কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এযুগের ক্রেতারা হালকা সবুজ রঙের পেয়ারাই বেশি পছন্দ করে। ক্রেতাদের মানসিকতা অনুযায়ী কৃষকরা বিকল্প পদ্ধতির সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে। এসেছে ঠোঙা বাঁধার অনুষঙ্গ।

চাষ করে আর পরতা নি, ভেড়িতি দেওয়াই ভাল।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাছ চাষের অন্যতম মাধ্যম ভেড়ি। ভেড়ি হল নোনা জলের বৃহদাকার পুকুর। মূলত ব্যবসা ভিত্তিক মাছ চাষ হয় এখানে। নদী এলাকায় নদীর পার্শ্ববর্তী জমি গুলোতেই ভেড়ি করা হয়। কারণ ভেড়িতে নোনা জলের প্রয়োজন। কোনো এলাকার মাঠে একবার ভেড়ি তৈরি শুরু হলে সেই মাঠে সাধারণ চাষ-আবাদ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে চাষিরা তাদের সাধারণ জমিও ভেড়ি মালিকদের কাছে বন্ধক দেয় ভেড়ি করার জন্য।

ব্যবসা ভিত্তিক মাছ চাষ শুরুর আগে এই সম্পর্কে দক্ষিণবঙ্গের মানুষদের কোনো ধারণাই ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে এই অনুষঙ্গটি একেবারেই আধুনিক। কোনো মাঠে ভেড়ি তৈরি শুরু হলে সেখানকার অন্যান্য জমি নোনা জলের প্রভাবে লবণাক্ত হয়ে যায়। ফলে ঐ জমিতে চাষ করে যা লাভ হয়। তার তুলনায় জমি ভেড়িতে দিলে লাভের পরিমাণ বেশি হয়। কারণ এক্ষেত্রে কৃষককে চাষ করার জন্য কোনো খরচ করতে হয় না, অথচ বছরে কিছু নগদ টাকা পাওয়া যায়। মূলত একারণেই ভেড়িতে দেওয়ার প্রসঙ্গটি বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। এতে সাধারণ কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও উৎপাদন বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে।

কাঁতি মারার কথা লোকে এখন ভুলেই গেছে।
কাঁতি মারার প্রসঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। পূর্বে সেচের জল পরিবহনের মূল মাধ্যম ছিল ড্রেন। ফলে কাঁতি মারার দরকার পড়ত। কিন্তু এখন সেচের জল পরিবহনের জন্য উন্নত ধরনের পাইপ সহজলভ্য হয়েছে। জমির পাশাপশি ড্রেন রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গিয়েছে। ফলে কাঁতি মারার অনুষঙ্গ অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

কাঁতি মারা শব্দটি একটা সময় সাধারণ সমাজ জীবনেও বেশ প্রচলিত ছিল। নদী, খাল বা পুকুর পাড়ের বসত বাড়ির জমি ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে কাঁতি মারার দরকার পড়ত। কিন্তু বর্তমানে ভাঙনের হাত থেকে জমি রক্ষার জন্য গার্ড ওয়াল দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। কাঁতি মারলে জমি বেশিদিন সুরক্ষিত থাকে না, কিন্তু গার্ড ওয়াল একবার দিতে পারলে দীর্ঘদিন জমি সুরক্ষিত থাকে। তবে এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় অলোচনার প্রয়োজন। কাঁতি মারা অপেক্ষা গার্ডওয়াল দেওয়া অনেক বেশি ব্যায় বহুল। ফলে সকলের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। সম্পন্ন মানুষরা গার্ড ওয়াল দেওয়াকেই বেশি পছন্দ করে। কৃষিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে গেলেও সমাজ জীবনে শব্দটির কিছু ব্যবহার আজও আছে। তবে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা যেভাবে গ্রাম বাংলার জনজীবনকে গ্রাস করছে তাতে আর কত দিন এই অনুষঙ্গের অস্তিত্ত্ব থাকবে বলা মুশকিল।

আড়াআড়ি চললি অনেক ঠেক হত।

সাধারণ যাতায়াত সহ কৃষিজ দ্রব্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। জমির মাঝখান দিয়ে যাতায়াত হল আড়াআড়ি যাতায়াত। বর্তমানে শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই। কৃষি বিপ্লবের আগে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জমি ছিল এক ফসলি বা দু ফসলি। বছরের বেশিরভাগ সময় জমি ফাঁকা থাকার কারণে আড়াআড়ি যাতায়াতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন রাসায়নিক সার, অত্যাধুনিক সেচ পদ্ধতি হাইব্রিড চাষ প্রভৃতির কারণে সারা বছর জমিতে কোনো না কোনো ফসল থাকে। বছরের খুব কম সময় জমি ফাঁকা পড়ে থাকে। ফলে আড়াআড়ি যাতায়াতের সুযোগ এযুগে খুব কম।

সাধারণ সমাজ জীবনে কথাটির কিছু ব্যবহার আজও আছে। পথ সংক্ষেপ করার জন্য আড়াআড়ি যাতায়াতের প্রবণতা এখনও দেখা যায়। সাধারণ সামাজিকের মুখে কথাটির সামান্য ব্যবহার থাকলেও কৃষিক্ষেত্রে পরিবহনের কাজে বিষয়টি একেবারেই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। যদিও কথাটির প্রচলন উৎপত্তি কৃষিজ দ্রব্য পরিবহনের অনুষঙ্গে।

গরুর গাড়ি সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী

কুড়ি তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে কৃষিজ দ্রব্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিলো গরুর গাড়ি। বর্তমানে গরুর গাড়ির ব্যবহার খুব কমে গিয়েছে। গরুর গাড়ি অপেক্ষা অনেক উন্নত পরিবহন মাধ্যম প্রচলিত হওয়ায় গরুর গাড়ি দিনে দিনে কৃষিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গরুর গাড়ির ব্যবহার কমে যাওয়ায় ঐ সংক্রান্ত বহু শব্দ হারিয়ে যেতে চলেছে। যেমন-গজাল দেওয়া কি জিনিস এখন অনেকেই জানে না। গরুর গাড়ির চাকার লোহার বেড় গরম কালে বেড়ে গেলে কাঠের কাঠামো ও বেড়ের মাঝে ফাঁক তৈরি হত। ঐ ফাঁকে কাঠ গুজে ভরাট করতে হত। বর্তমানে গরুর গাড়ির ব্যবহার কমে যাওয়ায় ঐ শব্দের ব্যবহারও কমে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় সীমিত পরিসরে গরুর গাড়ির ব্যবহার থাকলেও কাটের তৈরি পুরানো দিনের সেই চাকা আর ব্যবহার করা হয় না। এখন তার পরিবর্তে আধুনিক বিয়ারিং সম্বলিত গাড়ির চাকা ব্যবহৃত হচ্ছে। কাঠের চাকার পরিবর্তে গাড়ির চাকা লাগানো ব্যয় বহুল। তা সত্ত্বেও গাড়ির চাকা ব্যবহৃত হচ্ছে বেশি। কারণ গাড়ির চাকা অনেক বেশি দীর্ঘ মেয়াদি এবং

এর সংরক্ষণ খরচা অনেক কম। কাঠের চাকার ব্যবহার কমে যাওয়ায় গজাল দেওয়া ব্যাপারটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

ওলা হয়ে গেলে কিন্তু মুশকিল হবে খুব।

গরুর গাড়ির সামনের ও পিছনের অংশের মধ্যে ওজনের সমতা বজায় রাখতে হয়। অন্যথায় গরু গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে না। কোনো একদিকে ওজন বেশি হলে বলা হয় ওলা হয়ে গেছে। গরুর গাড়ির সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ওলা হওয়ার ভয় এর বিষয়টি। আসলে এযুগের গরুর গাড়ি অনেক আধুনিক। পূর্বে বলদ গরু বা কৃষিজ ভাষায় এঁড়ে গরু দিয়ে গাড়ি টানা হত। কিন্তু এযুগে গরু দিয়ে গাড়ি টানার পরিমাণ খুব কম, প্রায় নেই বললেই চলে। পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে হ্যাণ্ড ট্রাক্টর। এক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ফাল খুলে রাখা হয়। গাড়িটি ট্রাকটরের সঙ্গে জোড়া থাকায় ওলা হওয়ার ভয় থাকে না।

গড়ি জোড়া হয়ে গেল, এদিকে ওদের দেখা নি

যখন যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল তখন প্রায়শ এই ধরনের বাক্যবন্ধ শুনতে পাওয়া যেত। গাড়িতে গরু জুড়ে দেওয়া হল গাড়ি জোড়া। কথাটি এখন প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। এখন গরুর গাড়িতে যাতায়াত প্রায় নেই।

এখন পাঁচ বাড়ি খুঁজলেও একটা গড়ে পাওয়া যায় না

গরুর গাড়ির চাকা আর পূর্বের মত নেই। গরুর গাড়ির কাঠের চাকার মাঝখানে যে মোটা অংশ থাকে তাকেই গড়ে বলে। কৃষিজ সমাজে গড়ের বিচিত্র ব্যবহার ছিল। ধান ঝাড়ার কাজে গড়ে ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় প্রতি কৃষকের বাড়িতে কয়েকটা করে গড়ে থাকত। বর্তমানে আধুনিক গাড়ির চাকা ব্যবহৃত হওয়ায় গড়ে জিনিসটাই আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ধান ঝাড়ার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। এখন গড়ে না থাকলেও বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই। কৃষকরা তাই ঐ জিনিস আর সংরক্ষণ করে না।

ছই গাড়িতে করে তখন বউ আসতো

ছই গাড়ি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এর ব্যবহার বর্তমানে একদম নেই। এর কারণ

পরিবহনের নিত্য নতুন আধুনিক মাধ্যম। ছই গাড়িতে যাতায়াত করতে সময় বেশি লাগত এবং বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। আধুনিক পরিবহন মাধ্যম অনেক দ্রুত গতির এবং আরামদায়ক। ফলে ছই গাড়ির ব্যবহার কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বেশ সম্মানের ছিল সেদিনের ছই গাড়িতে যাতায়াত করা। দৈনন্দিন যাতায়াতের পাশাপাশি সেদিনের পুরুষরা বিয়েও করতে যেত ছই গাড়িতে চেপে। বাঙালি জীবনের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হয়ে ছিল গরুর গাড়ি। আজকে যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গরুর গাড়ি বাঙালি জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখ পাওয়া বা এই ঐতিহ্য ধরে রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে এই ইতিহাস সংরক্ষণের দরকার আছে।

সেচ ব্যবস্থা : ছেউতি থেকে কিলোস্কার, ডিপ কল কতকিছুই দেখতে হচ্ছে।
বর্তমান কৃষি পদ্ধতিতে জলসেচ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক জলসেচ পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে কৃষকরা প্রকৃতির উপরে সর্বাংশে নির্ভর করে থাকতো। প্রথম দিকে সেচ করা হত মূলত ছেউতির সাহায্যে। ইতিপূর্বে আমরা তার আলোচনা করেছি। ছেউতি দিয়ে জলসেচের অনেক অসুবিধা ছিল। জলাশয় থেকে দূরের জমিতে ছেউতি দিয়ে সেচ করা যেত না। পরবর্তীতে আবিষ্কার হয় জলসেচ মেশিন বা দমকল। দমকলের মাধ্যমে জলসেচ শুরু হওয়ায় ছেউতির ব্যবহার কমতে থাকে, পরিবর্তে দমকল ও তৎসংলগ্ন জিনিসপত্রের ব্যবহার বাড়তে থাকে। যেমন সেকশন পাইপ, সার্ভিস পাইপ, মুদো, হলার, তেল পিস, হ্যাণ্ডেল প্রভৃতি। দমকলের এইসব যন্ত্রাংশের নাম কৃষি ভাষায় অবাধে প্রবেশ করেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জলসেচ মেশিনেও অনেক বিবর্তন এসেছে। প্রথম দিকে ব্যবহার হত কিলোস্কার কোম্পানির বেশ বড় আকারের মেশিন। আকারে বড় ও ওজনে ভারি হওয়ার কারণে ঐ মেশিন ব্যবহারে অনেক সমস্যা ছিল। জলাশয় থেকে বেশি দূরের জমিতে মেশিন নিয়ে যাওয়া যেত না। হণ্ডা মেশিন আবিষ্কারের পর সেই সমস্যার সমাধান হয়। হণ্ডা মেশিনের আকার ছোটো এবং ওজনও কম। ফলে ব্যবহার অনেক সুবিধাজনক হয়।

বর্তমান দিনে কৃষি কাজে জলসেচের বিষয়ে সরকার সচেতন হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ পরিস্থিতে অনুযায়ী সরকার সেচের অনেক মাধ্যম তৈরি করেছে। ডিপ টিউব ওয়েল, মিনি

টিউব ওয়েল, সাব মার্সিবেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে জলসেচের উন্নতি সাধন করেছে। এইসব নতুন পদ্ধতির ফলে ডিপ কল, মিনি, স্যালো, ড্রেন প্রভৃতি নতুন শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেগুলোর ব্যবহার আগে ছিল না।

দক্ষিণবঙ্গের এমন অনেক জেলা আছে যেখানে ডিপ টিউব ওয়েল বা মিনি টিউব ওয়েল বসানো সম্ভব নয়। যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলা। এখানে ভৌম জলের লেয়ার এত নিচে যে সেচ কাজের জন্য মাটির তলা থেকে বেশি পরিমাণে জল তুললে গ্রীষ্মকালে খাওয়ার জলের অভাব দেখা দেবে। এই কারণে ঐসব জেলায় ক্যানেল এর ব্যবস্থা করেছে সরকার। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেই জল ক্যানেলের মাধ্যমে কৃষি জমির কাছাকাছি পৌঁছে দিচ্ছে। এই ক্যানেল পদ্ধতির কথা উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কৃষকরা জানেই না।

বিভিন্ন জেলায় জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত। ফলে জেলাভেদে জলসেচ সংক্রান্ত শব্দ, কথার প্রভেদ আছে। তবে সেচ কাজের মূল বিষয় সব জেলায় সমান, তাই সময়ভেদে সেচ ব্যবস্থার যে বিবর্তন তা পুরো দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই সত্য। এই বিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ভাষায়। কখনো পুরানো শব্দ-কথা হারিয়ে গিয়েছে আবার কখনো নতুন শব্দকথা তৈরি হয়েছে।

জমিতে চাষ দেওয়া : ট্রাকটরের হালখাতা, বাপের জন্মে শুনিনি।

কৃষিকাজের একটি বিশেষ পর্যায় জমিতে চাষ দেওয়া বা জমি চষা। কৃষি সংস্কৃতির প্রথম যুগ থেকে জমিতে চাষ দেওয়া শুরু হয়েছে এবং বর্তমানেও তা সমান মাত্রায় বজায় আছে। আসলে জমি চষা ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়। চাষ দেওয়া ব্যাপারটা সব যুগের সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক হলেও সময়ভেদে চাষ দেওয়ার পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন এসেছে। প্রথম যুগে শক্ত কাঠ দিয়ে জমি খোড়া হত। পরে গরু দিয়ে টানা লাঙল তৈরি হয়। কৃষি বিপ্লবের একটি অন্যতম অধ্যায় লাঙল তৈরি। এর ফলে কৃষি সংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে। লাঙল তৈরির পর প্রথম যুগের তুলনায় একসঙ্গে অনেক বেশি জমিতে চাষ করতে সক্ষম হয় কৃষকরা। দীর্ঘদিন লাঙল কৃষকদের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং লাঙল সংক্রান্ত শব্দাবলী কৃষি ভাষায় স্বমহিমায় বিরাজ করেছে। যেমন জোয়াল, মুট, ফাল, পাঁচন, সাঁয়া গরু, ঈশ, আঁকড়া প্রভৃতি।

উল্লেখিত শব্দ গুলি বর্তমান কৃষি ভাষা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ চাষ দেওয়া পদ্ধতির পরিবর্তন। এখন চাষ দেওয়ার প্রধান মাধ্যম ট্রাক্টর। লাঙল অপেক্ষা ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষা অনেক সুবিধাজনক। কারণ এতে অল্প সময়ে অনেক বেশি জমিতে চাষ দেওয়া যায় এবং চষার গুণগত মান ভালো হয়। ফলে লাঙল কেন্দ্রিক শব্দ গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তবে পাশাপাশি অনেক নতুন শব্দও তৈরি হয়েছে। যেমন ফাল ভাঙা, ট্রাক্টরের হালখাতা। ট্রাকটরের মালিক চাষের মরসুমে যে চায় তার জমি চষে দেয় একদিক থেকে। পরে সময় মতো বকেয়া টাকা আদায় করার জন্য হালখাতা করে। একেই বলে ট্রাকটরের হালখাতা। ট্রাকটরের হালখাতার বিষয়টি আগেকার কৃষকরা ভাবতেই পারত না। আবার সাঁয়া গরু-র বৃত্তান্ত আগামী একশো বছর পরে বাঙালি কৃষকরা আর হয়তো জানবেই না।

ধান ঝাড়া : দলবেঁধে ধানছাড়ার মজাই আলাদা। মেশিনে এসব হয় না।
বর্তমান দিনে ধান ঝাড়ার জন্য আধুনিক ধান ঝাড়া মেশিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর পূর্বে ধান ঝাড়া হত কাঠের পাটাতনে বা ঝালনের উপর ধান গাছকে আঘাত করে। মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ায় ঝালন, গড়ে প্রভৃতির ব্যবহার কমে গিয়েছে। এসব কৃষিজ উপকরণ তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে আগে অনেক লোক লাগতো, বর্তমানে তা আর লাগে না। বর্তমান দিনে ঝালন তৈরি করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যাও কম। পূর্বের পদ্ধতিতে ধান ঝাড়তে অনেক বেশি সময় ও কৃষি শ্রমিক লাগতো, মেশিন দিয়ে ধান ঝাড়ার রেওয়াজ চালু হওয়ার পর তা আর লাগে না। তাই বলা যায় ধান ঝাড়া মেশিন যেমন কৃষি কাজকে অনেক সুবিধাজনক করে দিয়েছে তেমনই বহু মানুষকে বেকার করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধান ঝাড়া মেশিনের ব্যবহার বাড়বে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি হারিয়ে যাবে ঝালন, গড়ে প্রভৃতির ব্যবহার।

আলোচ্য বাক্যবন্ধে আরও একটি বিষয় ফুটে ওঠে। তখনকার দিনে ঝালন গড়ে দিয়ে ধান ঝাড়ার সময় এক সঙ্গে বহু মানুষ কাজ করত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা, গল্প গুজব। তৈরি হত নিত্য নতুন ধাঁধা, ছড়া। বর্তমান দিনে মেশিন দিয়ে ধান ঝাড়া শুরু হওয়ায় দল বেঁধে ধান ঝাড়ার দরকারই নেই। একজন মানুষই একসঙ্গে বহু ধান ঝেড়ে নিতে পারে। পরিবর্তিত এই প্রেক্ষিতে

নতুন নতুন ছড়া, ধাঁধার উদ্ভবের সম্ভাবনা খুব কম।

উড়োন দেওয়া : হাওয়া খাওয়ানোটাই শুধু বাকি। কারেন্ট এলিই হয়ে যাবে।
ধান গাছ থেকে ধান বার করার পুরো কাজটা কতকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। এর একটা পর্যায় উড়োন দেওয়া। ধানের মধ্যে মিশে থাকা পল, নোংরা পরিষ্কার করার জন্য উড়োন দেওয়ার দরকার। পূর্বে উড়োন দেওয়া হত বাতাসের অভিমুখে। পর্যাপ্ত বাতাস না বইলে উড়োন দেওয়া যেত না। বর্তমান দিনের কৃষকরা আর প্রাকৃতিক বাতাসের অপেক্ষা করে না। এখন তারা অত্যাধুনিক টেবিল ফ্যান এই কাজে ব্যবহার করে। উড়োন দেওয়া কথাটি প্রচলিত হয়েছে হাওয়ার অনুকূলে নোংরা উড়িয়ে দেওয়া হত বলে। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানে হাওয়া খাওয়ানো বা হাওয়া দেওয়া কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে কৃষি ভাষাও।

খামার : খামার বাড়িতে ঘর করতি বাধ্য হয়েছে। জায়গা নি তা কি করবে।
একটা সময় কৃষি পদ্ধতির অপরিহার্য একটি অধ্যায় ছিল খামার। কিন্তু এখনকার কৃষি সংস্কৃতি থেকে খামার প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রাম বাংলায় স্থানে অসংকুলান দেখা দিয়েছে। গ্রামের কৃষকরা চাষ জমিতে বসতবাড়ি করতে চায় না। কিন্তু বসত বাড়ির জন্য জমি দরকার। ফলত খামারের জন্য আলাদা করে জমি রাখার সুযোগ থাকছে না কৃষক সমাজের। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে খামার। এর কারণে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে খামার কেন্দ্রিক অনেক শব্দ কথা। যেমন খামার বাড়ি, খামারে তোলা, খামার ন্যাতা দেওয়া। অথচ এইসব কথা এক সময় কৃষি সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে কথাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাতা দেওয়া : খামার ন্যাতা দিতি তখন হেড়ো চলকে যেত
ন্যাতা দেওয়া কথাটির উদ্ভব খামার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকে। যে কোনো ফসল খামারে তোলার আগে খামারের ধূলো মারার জন্য খামার ন্যাতা দিতে হত। বর্তমান দিনে কৃষি সংস্কৃতি থেকে খামারের অনুষঙ্গ হারিয়ে যাচ্ছে। কেন হারিয়ে যাচ্ছে তার আলোচনা আমরা আগে করেছি। খামার না থাকার ফলে ন্যাতা দেওয়া কথাটির ব্যবহারও কমে যাচ্ছে। খামার পরিষ্কার বা খামার তৈরি থেকে কথাটির উৎপত্তি হলেও

কৃষি সংস্কৃতিতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার ছিল। দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের অধিকাংশই ছিল মাটির ঘর। মাটির মেঝে সংরক্ষণের জন্যেও ন্যাতা দিতে হত। ধীরে ধীরে কৃষক সামাজ থেকে মাটির ঘর কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কারণে গ্রাম বাংলায় মাটির ঘর আর দেখতে পাওয়া যায় না। ন্যাতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাই দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় এমন হচ্ছে তা বলা যায় না। যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখনও প্রচুর। ফলে ঐসব জেলায় মাটির ঘর আজও আছে। ন্যাতা দেওয়ার প্রসঙ্গ সেখানে আজও সত্য। কিন্তু কলকাতা ও তৎসংলগ্ন জেলায় কথাটির ব্যবহার খুব কম। কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার সাধারণ প্রয়োগ এমনিতে কম। তবে এই শব্দটির ব্যবহার ছিল প্রচুর। ধীরে ধীরে এর ব্যবহারও কমছে।

বীজ রাখা : বীজের জাতে থাক এই পেপে কটা।

কোনো ফসল কে পুনরায় চাষ করার জন্য সেই ফসলের বীজ রেখে দেওয়ার দরকার হত। অনেক সময় ফসলের কোনো বিশেষ প্রজাতিকে বাঁচানোর জন্য বীজ রেখে দিতে হত কৃষক সমাজকে। বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই কমে গিয়েছে। এর কারণ ফসলের বীজ সংরক্ষণের জন্য অনেক আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে এখনকার কৃষকদের আর আলাদা করে বীজ রাখার দরকার পড়ে না। এখন সব রকম চাষের বীজ, চারা, দানা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রি হয়। কৃষকরা যেমন যা প্রয়োজন টাকার বিনিময়ে তা কিনে এনে চাষ করতে পারে। কিন্তু এই সুবিধা অতীতে ছিল না। তখন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের থেকে কিছু অংশ আলাদা করে রেখে দিত। বীজের জাতে কথাটির উদ্ভব এভাবেই।

উৎপাদিত ফসলের যে অংশ বীজের জাতে রাখা হত অভাবের পরিমাণ বাড়লেও সেই অংশকে কৃষক সমাজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতো না। বিষয়টি নিয়ে কৃষক সমাজে অনেক সংস্কারও প্রচলিত ছিল। নোংরা শরীরে বা স্নান না করে কোনো কৃষক বীজের জাতে রাখা ফসলকে স্পর্শ করতো না। তাদের ধারণা সেক্ষেত্রে বীজ অপবিত্র হয়ে যায়। বীজ অপবিত্র হলে তার থেকে আর ভাল ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে না।

ফসলের বীজ নিয়ে ব্যবসা শুরু হওয়ার পর এক শ্রেণির কৃষকরা এই কাজই করে। তারা উন্নত

প্রজাতির বীজ তৈরি করে এবং তা সারা বছর বিক্রি করে। অন্যান্য কৃষকরা তাদের থেকে বীজ কিনে চাষ-আবাদ করে। সরকারও এক্ষেত্রে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অল্প দামে কৃষকদের মধ্যে বীজ বিতরণ বা বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করছে সরকার। ফলে বীজ রাখা বা বীজের জাতে রাখা প্রভৃতি প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির রেওয়াজ কমছে।

বুজলো দেওয়া : বুজলো দেওয়ার জন্য যদি হাতের কাছে কিছু পাওয়া যায় ছাই।
শব্দটি ফসল সংরক্ষণ বিষয়ে প্রচলিত ছিল। মূলত ছেঁড়া পাটের বস্তায় দানা শস্য রাখার সময় ঐ ছেঁড়া অংশে খড় বা অন্যান্য কিছু গুঁজে তা ব্যবহারের উপযোগী করা হত। আধুনিক যুগে পাটের বস্তা ব্যবহারের রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পলিথিনের বস্তা। বর্তমান বাজারে পলিথিনের বস্তা সহজলভ্য এবং তা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের উপযুক্ত। এখনকার কৃষকদের আর ছেঁড়া পাটের বস্তা বুজলো দিয়ে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

পলিথিনের বস্তা আবিষ্কারের পূর্বে বুজলো দেওয়া কথাটি ছিলো কৃষক সমাজে অতি পরিচিত বিষয়। এই কাজের জন্য কৃষকরা ধানের খড় বা পল সংরক্ষণ করত। এখন এসবই অতীত হওয়ার পথে। পলিথিনের বস্তা আবিষ্কারের পর কৃষি পদ্ধতি থেকে আরও একটি জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। সেটি হল গুণ সুই। গুণ সুই সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। পাটের বস্তার ছেঁড়া অংশ বুজলো দেওয়ার অযোগ্য হয়ে গেলে তা সেলাই করার দরকার পড়ত। গুণ সুই ও পাটের মোটা সুতো দিয়ে তা সেলাই করা হত। তখনকার দিনে প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবারে কয়েকটি করে গুণ সুই থাকত। এখনকার কৃষক পরিবারে গুণ সুই বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পলিথিনের বস্তা চালু হওয়ার পরই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বাগান করা : সব জমিতে বাগান করে দেবো বলে ভাবছি।
আধুনিক কৃষি পদ্ধতির একটি অতি পরিচিত বিষয় বাগান করা। বিভিন্ন বিকল্প জীবিকা প্রচলনের পূর্বে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে থাকতো। ফলে কৃষক তার সমস্ত জমিতে চাষ-আবাদ করতো। কিন্তু বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হওয়ায় বহু

বিকল্প জীবিকা তৈরি হয়েছে। কৃষক সমাজের সব মানুষ আর সরাসরি কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই। বহু মানুষ জীবিকার অন্যান্য মাধ্যম বেছে নিচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে শ্রমিক সমস্যা। আবার বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে কিছু কিছু কৃষিজ পণ্যের বাজার চাহিদা কমে গিয়েছে। যেমন পাট। এই সব নানা কারণে কৃষকরা তাদের সব জমিতে আর চাষ করছে না। যেসব জমি চাষের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী সেখানেই চাষ করছে, অন্যান্য জমিতে শাল, সেগুন, লম্বু, ইউক্যালিপ্ট্যাস, মেহগিনি প্রভৃতি গাছের বাগান লাগাচ্ছে। এই ধরনের বাগান করতে কৃষকদের একবারই খরচ করতে হয়। দশ পনেরো বছর পরে গাছ বড় হলে একসঙ্গে সব গাছ বিক্রি করলে বেশ মোটা টাকা হাতে আসে। কৃষকরা কোনো জমিতে বাগান তখনই করে যখন ঐ জমিতে সাধারণ চাষ করে আর বিশেষ লাভের আশা থাকে না।

ফলের বাগান করাও বর্তমান কৃষি পদ্ধতির একটি বিশেষ অধ্যায়। এক্ষেত্রে জমিতে আম, লিচু, পেয়ারা, কুল, কলা প্রভৃতি ফলের গাছ লাগায় কৃষকরা। কয়েক বছর পরিচর্যার পর গাছে ফল ধরতে শুরু করলে কৃষকরা তা বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। এই ধরনের চাষে নিয়মিত পরিচর্যা খরচা বিশেষ থাকে না। একারণে এখানে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। কৃষিক্ষেত্রে পরিচর্যা খরচা দিনে দিনে বাড়তে থাকায় বাগান করার প্রবণতা কৃষক সমাজের মধ্যে দিনে দিনে বাড়ছে। ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে বাগান করা, বাগান করবো ইত্যাদি কথারূপগুলি।

জাব তোলা : জাব তোলার জন্য তখন মাঠে কত ডোবা তৈরি করা হত।

পান চাষের ক্ষেত্রে পান গাছের গোড়ার মাটি সব সময় ভিজে থাকতে হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে পানের ফলন কমে যায়, পানের আকার বড় হয় না। যা পান চাষির পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। আধুনিক সেচ পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে পান গাছের গোড়ার মাটি ভিজে রাখার জন্য পুকুরের কাদা তুলে গাছের গোড়ায় দেওয়া হত। এটি পান চাষের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল। পুকুরের কাদা বা জাব তুলে গাছের গোড়ায় না দিলে ফলন ভাল হত না। কিন্তু বর্তমান দিনে এই বাধ্যবাধকতা আর নেই। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জাব তোলার প্রয়োজনীয়তা কমেছে। সপ্তায় একবার বা দুইবার জল সেচ করলে পান গাছের গোড়ার মাটি নরম থাকে।

রাসায়নিক সার আবিষ্কারের পূর্বে সাধারণ চাষ জমিতেও জাব তুলতে হত। এক্ষেত্রে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জাব তোলা হত। পুকুরের কাদায় প্রচুর পরিমাণে হিউমাস থাকায় তা জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করতো। এখন সেই কাজ করা হয় রাসায়নিক সারের দ্বারা। জাব তোলা কৃষি সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি অনুষঙ্গ ও কথারূপ।

পড় টানা-পড় কাটানো: সময় মতো পড়টা কেটকে দিস কিন্তু, নইলি সব্বোনাশ হয়ে যাবে।
কৃষিক্ষেত্রে সেচ কাজের জন্য পলিথিনের পাইপ আবিষ্কারের পূর্বে সেচ কাজের একটি অন্যতম অধ্যায় ছিল পড় টানা। তখন প্রতিটি জমির পাশ দিয়ে নালা কেটে রাখা হত। ঐ নালা পথে জল সব জমিতে পৌঁছে যেত। এখন এই কাজের জন্য আধুনিক পাইপ সহজলভ্য হয়েছে। পড় টানার দরকার কমে গিয়েছে। তবে পড় এর প্রয়োজনীয়তা যে একেবারে নেই তা নয়। সীমিত পরিসরে এর ব্যবহার আজও আছে। এখন পড় টানার বিশেষ প্রয়োজানীয়তা না থাকায় অপ্রচলিত প্রায় হয়ে পড়েছে পড় কাটানো কথারূপটি।

আচাট জমি : আচাট জমি বলে আর কিছু থাকবে না দিনে দিনে।
বর্তমান কৃষি সংস্কৃতিতে আচাট জমি আর বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ এখন ঘাস মারার জন্য বিশেষ বিশেষ ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে। যেমন **ROUND UP .** আচাট জমির ঘাস আগাছা পরিষ্কার করার জন্য এই ঔষধ দারুণ কাজ করে। কৃষকরা ইচ্ছা করলেই যে কোন আচাট জমিকে সহজেই চাষ যোগ্য করে নিতে পারে। তাই বর্তমানের প্রেক্ষিতে কোন জমিকে আচাট জমি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

এই সুবিধা **ROUND UP** আবিষ্কারের পূর্বে ছিল না। তখন আচাট জমিকে ঐ নামেই চিহ্নিত করতে বাধ্য ছিল কৃষকরা। কারণ তারা চাইলেও ঐ জমিকে সহজে চাষ যোগ্য করতে পারত না। তাছাড়া সেদিনের কৃষি সংস্কৃতিতে আচাট জমিরও কিছু প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ তখন অধিকাংশ কৃষক পরিবার গরু পালন করত। ঐসব গরুর চরে খাওয়ার জন্যেও কিছু অনাবাদি জমি রাখতে হত কৃষকদের। এখনকার দিনে গরু পালনের রেওয়াজ কমেছে। ফলে গরু চরার জন্য আলাদা করে জমি ফেলে রাখার দরকার

নেই। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আচাট জমি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে আচাট জমি এই কথারূটি।

উল্লেখ্য জমিতে **ROUND UP** প্রয়োগকে কৃষিজ ভাষায় বলা হয় পোড়া মারা। **ROUND UP** আবিষ্কারের পূর্বে এই অনুষঙ্গেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি কৃষি পদ্ধতির আর একটি নতুন অধ্যায়।

আকাশের পানি : আকাশের পানির সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না।
কৃষি কাজে জল একটি বিশেষ উপকরণ। কৃত্রিম জল সেচ চালু হওয়ার পূর্বে বৃষ্টির জলেই চাষ-আবাদ হত। পরবর্ত্তীতে কৃত্রিম জলসেচ চালু হওয়ার পর সেচের জল ও বৃষ্টির জল উভয় মাধ্যমেই কৃষি কাজ চলতে থাকে। জলসেচ পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে আকাশের জল বা বৃষ্টির জলের আলাদা কোনো পরিচয় ছিল না। সেচ পদ্ধতি আবিষ্কারের পর এই বিভিন্নতা তৈরি হয়েছে। ছ্যাঁচা পানি, আকাশের পানি ইত্যাদি কথাগুলি কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের ইতিহাসকে বহন করে।

কৃত্রিম জলসেচ প্রচলিত হওয়ার পর কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে। কৃষি কাজে বর্তমানে যে পরিমাণ বৈচিত্র্য এসেছে কৃত্রিম জলসেচ প্রচলনের পূর্বে তা ছিল না। তখন বিশেষ বিশেষ চাষের জন্যে বিশেষ বিশেষ ঋতুর অপেক্ষায় থাকতে হত। ধান চাষে জলের দরকার বেশি বলে মূলত বর্ষাকালে ধান চাষ হত। শীতকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় সব্জি চাষ বিশেষ হত না। নির্দিষ্ট কিছু সব্জি গ্রীষ্ম কালে চাষ হত। এখন এই প্রতিবন্ধকতাগুলো অনেক কমে গিয়েছে। তবে চাষের কাজে বৃষ্টির জলের গুরুত্ব আজও সমান ভাবে বজায় আছে। কৃষকরা সেচের জল অপেক্ষা বৃষ্টির জলে চাষ-আবাদ করতে বেশি পছন্দ করে। কারণ বৃষ্টির জলে চাষ করতে পারলে ফলন ভালো হয় এবং চাষে খরচ কম হয়। আবার কোনো জমিতে অতিরিক্ত সেচের জল ব্যবহার করলে জলের আয়রন ঐ জমির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দেয়। যা কৃষকদের জন্য বিশেষ মাথা ব্যথার কারণ।

পরিবেশ দূষণের কারণে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। এখন বর্ষাকালের ধানচাষেও জমিতে কৃত্রিম জলসেচ করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা। কৃষি সংস্কৃতির জন্য যা খুব খারাপ ইঙ্গিত।

বর্ষাকালের ধান চাষে গা ধোয়ানো জল বা গা ধোয়ানো পানি কথাটির প্রচলন আছে। এখানে বৃষ্টির জলে ধান গাছ ধুয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। বর্ষার ধানচাষে ধান গাছের জন্য ‘ গা ধোয়ানো জল ’ খুবই উপকারী। বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় গা ধোয়ানো জল কৃষকরা বিশেষ পায় না। গা ধোয়ানো জল বা গা ধোয়ানো পানি কথাগুলিও তাই আস্তে আস্তে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে।

স্প্রে করা : সময়মত স্প্রে করে দিলে পোকা পঙ্গপাল কিছু করতে পারবে না।
কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে স্প্রে করা কথাটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তরল কীটনাশক আবিষ্কারের পর কথাটির প্রচলন হয়। স্প্রে শব্দটি ইংরাজি। কৃষক সমাজ সহজেই এই শব্দটি ব্যবহার করে। কলকাতা ও তৎসংলগ্ন জেলা গুলোতে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষকদের ভাষায় পড়েছে তার অনিবার্য প্রভাব। স্প্রে করা কথাটির উদ্ভবের পিছনে শিক্ষা একটি অন্যতম কারণ। স্প্রে করা কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে তেল দেওয়া কথাটির ব্যবহার ছিল আগেকার দিনে। বর্তমানে স্প্রে করা কথাটির ব্যবহারই বেশি।

গুবরে সার : এক বিঘে জমিতে তখন অন্তত দশ ডোঙা গুবরে সার দিতাম আমরা।
ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জমিতে সার দেওয়ার রেওয়াজ কৃষি সংস্কৃতিতে বহু কালাবধি প্রচলিত। রাসায়নিক সার আবিষ্কারের পূর্বে গোবর সারই ব্যবহার করা হত। তখন অধিকাংশ কৃষক পরিবার গরু পালন করত। গরুর গোবর সারা বছর সংরক্ষণ করে সার তৈরি করা হত। কৃষি জমির জন্য প্রয়োজনীয় সার অধিকাংশ কৃষকদের বাড়িতেই তৈরি হত। বর্তমানে গ্রাম বাংলা থেকে গরু পালনের রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। এর মূল কারণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। গ্রাম বাংলার একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে শুরু করায় কৃষক পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে গিয়েছে। গরু পালন করলে তার দেখাশুনার জন্য যে পরিমাণ লোক দরকার অধিকাংশ কৃষক পরিবারে তা আজ আর নেই। আবার বর্তমানে কৃষক পরিবারের সব সদস্য কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকছে না। তারা অন্যান্য পেশা বেছে নিচ্ছে। ফলে কৃষিকাজ করার মত মানুষের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এসব কিছুর মিলিত প্রভাব পড়েছে কৃষি পদ্ধতিতে। গরু পালন করে, গোবর সংগ্রহ করে, সার তৈরি করে জমিতে প্রয়োগ করা অপেক্ষা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা অনেক সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। বর্তমান কৃষক সমাজ এই সুবিধাটাই গ্রহণ করেছে সাদরে। ফলে কমে যাচ্ছে

গোবর সার প্রয়োগ।

গোবর সার প্রয়োগের রেওয়াজ কমে গেলেও তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। সীমিত পরিসরে এর ব্যবহার আজও আছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় গোবর সার ব্যবহারের পরিমাণ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলার তুলনায় বেশি। আসলে এইসব জেলা গুলোতে নগর সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে অনেক বেশি। যার প্রভাব পড়েছে কৃষি সংস্কৃতিতে। কৃষকরা বাধ্য হয়ে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলেও গোবর সারের প্রতি তাদের ভালোবাসা কমেনি। পরিস্থিতির কারণে গোবর সার ব্যবহার করতে না পারার যন্ত্রণা উক্ত বাক্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই যন্ত্রণার রেশ এযুগের অধিকাংশ কৃষকের বুকে।

সারগাদা : তখন এক মানুষ ভোর গর্তের সারগাদাও থাকতো কত বাড়িতে।

একটা সময় ছিল যখন প্রায় প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে সারগাদা থাকত, যেখানে বাড়ির সমস্ত নোংরা আবর্জনা ফেলা হত। ঐ আবর্জনা মাসের পর মাস পড়ে থেকে বৃষ্টির জলে ভিজে পচে একপ্রকার সার তৈরি হত। ঐ সার কৃষিক্ষেত্রে খুবই উপকারি। রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হওয়ায় সারগাদা আর দেখতে পাওয়া যায় না। সারগাদা কমে যাওয়ার আরও একটি কারণ আছে। দিনে দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সারগাদার জন্য আলাদা করে জায়গা ফেলে রাখা গ্রাম্য পরিবেশে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সারগাদার সঙ্গে আরও একটি শব্দ প্রায় একই ভাবে উচ্চারিত হত। সেটি হল গোবর গাদা। এখানে গরুর গোবর সারাবছর জমা করে রাখা হত। গোবর ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেলে তা জমিতে গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করা হত। কৃষি জমিতে গোবর সারের ব্যবহারও কমেছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে গোবর গাদা গুলো। কৃষকের বাড়িতে সারগাদা, গোবর গাদা থাকাকে একসময় গর্বের বিষয় বলে মনে করত কৃষক সমাজ। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার বিচারে সারগাদা , গোবর গাদা লজ্জার বিষয়। এখন যে মানুষ যত আধুনিক হতে পারবে সমাজে তার মূল্য তত বেশি। এসবের কারণেই হারিয়ে যেতে বসেছে সারগাদা, গোবর গাদা প্রভৃতি কথারূপ। উল্লেখ্য, এক মানুষ সমান বোঝাতে পাঁচ থেকে ছয় ফুটকে বোঝানো হয়।

ভারা করা : একটু বেশি খরচ পড়লেও ভারা করতে পারলে লাভ আছে।

যেসব ফসলের গাছ লতানো সেসব ফসল চাষেই ভারা করার রেওয়াজ বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। যেমন লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, করল্লা, বরবটি, পটল। এইসব ফসল গুলি সবই মাটিতে ফলে। কিন্তু মাটিতে চাষ করলে ফলের রং ভালো হয় না। ফলের গায়ে মাটির দাগ থেকে যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলের রং এমন হয় যা দেখে পছন্দ হবে না। বাজারে এই রকম জিনিসের দাম অনেক কম হয়। এই কারণে কৃষকরা ভারা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। ভারা করলে ফসল মাটির উপরে ঝুলতে থাকে। ফলে রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং এক্ষেত্রে ফসলের রং অনেক উজ্জ্বল হয়। এযুগের ক্রেতারা চকচকে রঙের জিনিসই বেশি পছন্দ করছে। ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী কৃষকরা চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে।

ভারা করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের পূর্ব-পুরুষরা অনুভব করেনি। সেদিনের ক্রেতারা ফসলের রঙের বিষয়ে এখনকার মত এত সচেতন ছিল না। আধুনিক সভ্যতার কারণে মানুষ রঙের বিষয়ে এমন অবস্থান নিয়েছে। চকচকে জিনিস কেনাতেই এখনকার মানুষের বেশি আগ্রহ।

ধান ঝাড়া : ধান ঝাড়ার লোকজন ঠিক করে তবে অন্য কাজ।

জমিতে ধান পাকার পর ধান গাছ কেটে বাড়িতে বা খামারে নিয়ে ধান গাছ থেকে ধান আলাদা করতে হয়। একে ধান ঝাড়া বলে। কাজটিকে বোঝাতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় এই একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। তবে জেলা ভেদে এ কাজের উপকরণ ও পদ্ধতিতে নানা পার্থক্য দেখা যায়। যেমন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রায় সব জায়গায় এখনও এই কাজে মূলত ঝালন ব্যবহার করা হয়। ধান ঝাড়া মেশিনের ব্যবহার খুব কম। মেশিনের ব্যবহার একেবারে নেই তা নয়, তবে পরিমাণ খুব কম। তুলনায় অন্যান্য জেলায় মেশিনের ব্যবহার অনেক বেশি।

ধান ঝাড়া মেশিন আবিষ্কারের পূর্বে ঝালন, গড়ে, কাঠের পাটাতন ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। এক্ষেত্রে ঝালনের একপাশে গড়ে দিয়ে তার উপর ঝালন রাখা হত। তাতে ঝালনের একপাশ উঁচু ও একপাশ নিচু হয়ে কিছুটা ঢালু হয়ে অবস্থান করতো। এরপর ঐ ঝালনের উপর ধানের আঁটি আঘাত করে করে ধান ঝাড়া হত। কোনো কোনো জায়গায় ঝালনের পরিবর্তে কাঠের পাটাতন ব্যবহার করা হত। বর্তমানে ধান

ঝাড়া মেশিন আবিষ্কারের ফলে ঝালনে বা কাঠের পাটাতনে ধান ঝাড়ার রেওয়াজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঝালন বা পাটাতনে ধান ঝাড়ার চেয়ে মেশিনে ধান ঝাড়া অনেক সুবিধা। এক্ষেত্রে সময় ও শ্রমিক দুটোই অনেক কম লাগে। কম সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ ধান ঝাড়া যায় মেশিনের সাহায্যে। এই মেশিন ব্যবহারের মিশ্র প্রভাব পড়েছে কৃষি সংস্কৃতিতে। সময় ও শ্রমিক খরচ কম হওয়ায় ধান চাষে কৃষকদের লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কৃষি শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান কৃষি ক্ষেত্রে অনেক উপকারে এসেছে একথা সত্য, কিন্তু কৃষি সংস্কৃতিতে পড়েছে বিরূপ প্রভাব। বহু খেটে খাওয়া মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে, তারা বিকল্প জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে পুরনো রীতিতে ধান ঝাড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝালন, গড়ে, ঝাড়া, ধান ঝাড়ার লোক ঠিক করা ইত্যাদি শব্দবন্ধ। মেশিন আবিষ্কারের পূর্বে ধান ঝাড়া লোকের বিষয়ে কৃষকদের ভাবতে হত না। প্রয়োজন মত লোক সবসময় পাওয়া যেত। বর্তমানে মেশিন আবিষ্কার ও অন্যান্য নানা কারণে কৃষি কাজে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে। তাই কৃষি শ্রমিকরাও অন্যান্য জীবিকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এমন অবস্থায় যেসব কৃষক আজও শ্রমিক দিয়ে ধান ঝাড়ায় তাদের সময়মত শ্রমিক পাওয়া বিশেষ চিন্তার বিষয়। ধান কাটা হয়ে গেলে ঝাড়ার শ্রমিক ঠিক না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই।

কৃষিজ অর্থনীতি

গাঁতিদার : সাতশো বিঘের গাতিদাঁরি ছিল ওদের।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন আসছে। অনেক বিষয় কৃষিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আবার অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে। গাঁতিদার তেমনই একটি অনুষঙ্গ যা বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। বাঙালি সমাজ জীবন থেকে জমিদার তন্ত্র উঠে যাওয়ার পরও কিছু অলিখিত জমিদার বাংলার কৃষক সমাজকে শোষণ করে যাচ্ছিল। বলা যায় জমিদার তন্ত্রের ফলাফল এরা। একটা সময় এরা গাঁতিদার নামে পরিচিত ছিল। এক একজন গাঁতিদার তিনশো চারশো বিঘা জমির মালিক ছিল। অতিরিক্ত জমির মালিক হওয়ার কারণে এরা গ্রামের অসহায় মানুষদের ভাগ চাষিতে পরিণত করে রেখেছিল। অজস্র অসহায় মানুষ গাঁতিদারের জমিতে ভাগ চাষ করলেও তাদের প্রাপ্য ভাগ তারা পেত না। গাঁতিদাররা অর্থ

ও বাহু বলের মাধ্যমে দিনের পর দিন বঞ্চিত করছিল ভাগ চাষিদের। ফলে সেদিনের গ্রাম বাংলার ভাগ চাষিদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল সঙ্গীন। স্বাধীনতার পরও বেশ কিছুকাল এই অবস্থা চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ভাগ চাষিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। লাঙল যার জমি তার আন্দোলন শুরু হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কার আইনে পরিবর্তন আনে। ঠিক হয় একজন মানুষের নামে সর্বোচ্চ আঠারো বিঘা জমি রেজিস্ট্রি থাকবে। এর বেশি কেউ জমি রাখতে পারবে না।

এই আইনের পর থেকে গাঁতিদার ব্যাপারটা দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে লোপ পায়। এতদিনের শোষিত কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো একটু একটু করে ভালো হতে থাকে। উঠে যায় গাঁতিদার, গাঁতিদারির ঐতিহ্য, সেইসঙ্গে উক্ত কথাবন্ধও।

ভাগ চাষ : ভাগে চাষ করে, লিজ নিয়ে লাল হয়ে গেল। খাটতে পারলে সব হয়।
দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্র উঠে যাওয়ার পর ভাগ চাষের অনুষঙ্গ তৈরি হয়। বিষয়টি আজও দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে সমান ভাবে বিদ্যমান। ভাগ চাষের রেওয়াজ তৈরি হওয়ার পিছনে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে দক্ষিণবঙ্গের সমাজ-অর্থনীতির পালাবদল। একটা সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম মাধ্যম ছিল কৃষিকাজ। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী চাষ আবাদকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকত। যাদের চাষযোগ্য জমি ছিল তারা নিজেরা চাষ করতো, যাদের ছিল না তারা অন্যের জমিতে মজুরি খেটে জীবন-যাপন করতো। কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ-অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। তৈরি হয়েছে জীবিকার অনেক বিকল্প মাধ্যম। ফলে বর্তমান দিনের মানুষ আর কেবলমাত্র কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে থাকে না। খুঁজে নেয় জীবিকার অন্যান্য বহু মাধ্যম।

বর্তমান মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীও অনেক পাল্টে গিয়েছে। কৃষিজ পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা অনেক কমেছে। ফলে চাষ-আবাদে পূর্বের মত আর মুনাফা নেই। যেমন পাট চাষ। পাটজাত দ্রব্য অপেক্ষা অনেক উন্নত ও আধুনিক ব্যবহার্য জিনিস আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটের চাহিদা কমে গিয়েছে। এইরকম আরও বহু ক্ষেত্রে একই রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা দ্বিবিধ। বিকল্প জীবিকার বহু মাধ্যম তৈরি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগান নেই, আবার চাষে মুনাফার পরিমাণও এখন অনেক কম।

এইসব নানা কারণে সম্পন্ন বহু কৃষক চাষ আবাদ বন্ধ করে জমি ভাগে দিয়ে দিচ্ছে। অন্যের জমি ভাগে নিয়ে চাষ করছে তারাই যাদের কৃষিকাজ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আর্থ-সামাজিক এই রকম অনেক পালাবদলের কারণে দক্ষিণবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ চাষের রেওয়াজ তৈরি হয়েছে এবং আজও তা স্বমহিমায় বিদ্যমান।

জমি ভাগে দেওয়া বা ভাগ চাষের সমতুল্য আরও একটি অনুষঙ্গ দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত আছে। সেটি হল জমি লিজে দেওয়া বা লিজে চাষ। বিষয়টি ভাগ চাষ বা জমি ভাগে দেওয়ার সঙ্গে প্রায় সমানুপাতিক হলেও ভাগে দেওয়া বা লিজে দেওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। জমি ভাগে দিলে যে কৃষক তা ভাগে নেবে তার থেকে জমির মালিক উৎপাদিত ফসলের ভাগ বা তার সমতুল্য টাকা পায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে যদি ভাগ চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে মালিককেও সেই ক্ষতির ভাগ নিতে হয়। মালিকের আর্থিক ক্ষতি না হলেও মুনাফা সে পায় না। জমি লিজ দিলে এইরকম কোনো বিপদের সম্ভাবনা মালিকের থাকে না। বছরের চুক্তিতে নির্দিষ্ট টাকা তারা প্রথমেই আদায় করে নেয়। চাষে ক্ষতি হলে মালিকরা তার দায়ভার নেয় না। আবার চাষে বেশি লাভ হলেও মালিক অতিরিক্ত টাকা পায় না। ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকায় মালিকরা জমি লিজে দিতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু কৃষকদের সাপেক্ষে জমি লিজ নিয়ে চাষ করা অপেক্ষা ভাগে নিয়ে চাষ করা নিরাপদ। কারণ এযুগে চাষ-আবাদ করা বেশ ব্যয়বহুল। লিজে সময় নির্দিষ্ট থাকে। তার মধ্যে চাষ করে লাভ করতে না পারলে আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।

ভাগে চাষ করে বা জমি লিজ নিয়ে অনেক কৃষক বেশ সম্পন্ন হয়ে ওঠে অনেক সময়। তাদের অবস্থার এই পরিবর্তন বোঝাতে উদ্ধৃত বাক্যবন্ধে লাল হয়ে যাওয়া কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

জিরেন দেওয়া : জমির জিরেন দেওয়ার দিন আজ আর নেই।

অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্বে কৃষি প্রসঙ্গে জিরেন দেওয়া কথাটির বেশ প্রচলন ছিল। কোনো জমিতে পর পর কয়েকবার চাষ করার পর জমির উর্বরতা শক্তি কমে যেত। তখন ঐ জমিকে পুনরায় চাষযোগ্য করার জন্য কিছুদিন ফাঁকা ফেলে রাখতে হত। ফাঁকা থাকার কারণে জমি অল্প দিনেই ঘাসে ভর্তি হয়ে যেত। তখন ঐ জমি মূলত গবাদি পশুর বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে

বিবেচিত হত। গ্রামের রাখালরা সমস্ত গরু মহিষ ঐ জমিতে ছেড়ে দিত এবং গরু মহিষের গোবর পড়ে পড়ে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পেত।

বর্তমান সমাজ অর্থনীতিতে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণে বাজার চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। এখনকার দিনে জমিকে দুই তিন মাস ফাঁকা ফেলে রাখার কোনো সুযোগ নেই এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কারণ রাসায়নিক সার সহজলভ্য হওয়ায় জমিকে যে কোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা যায়। অর্থাৎ জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো যায়। যে সুবিধা আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পায়নি। সেদিনের কৃষকদের জমিকে জিরেন দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আজ অনেক বিকল্প পদ্ধতি অবিষ্কৃত হওয়ায় জিরেন দেওয়ার রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা এযুগে তৈরি হয়েছে। আজকের দিনে কোনোকৃষক যদি বিশেষ করে জিরেন দেওয়ার লক্ষ্যে জমি তিন মাস ফেলেও রাখে, তাতে সে কৃষক বিশেষ লাভবান হবে না। কারণ অনুর্বর জমিকে উর্বর করতে হলে যে পরিমাণ গোবর সার দরকার সেই পরিমাণ গরু এখন আর মাঠে চরে না। ফলে জমি ফেলে রাখলেও জমির উর্বরতা বাড়বে না। এযুগের কৃষকরা এক প্রকার বাধ্য হয়েই রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে। জিরেন দিয়েও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তাই কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছে জিরেন দেওয়া কথাটি।

পান্তার বেলা : পান্তার বেলা পেরিয়ে যাচ্ছে এদিকে ভাতের দেখা নেই।

একটা সময় ছিল যখন কৃষি জমিতে কাজ করা শ্রমিকদের সকাল আটটা থেকে ন-টার মধ্যে পান্তা ভাত খেতে দিতে হত। ঐ সময়ের মধ্যে খেতে দিতে না পারাটা মালিকের পক্ষে লজ্জাজনক। তাই মালিকরা সময়ের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন থাকত। 'পান্তার বেলা পেরিয়ে যাওয়া' কথাটির উদ্ভব একারণেই। বর্তমান সময়ে কৃষি শ্রমিকরা আর মালিকের কাছে পান্তা ভাত খেতে চায় না। কারণ বর্তমান সমাজ অর্থব্যবস্থায় খদ্যাভাবে কেউ কষ্ট পায় না।। তাই কৃষি শ্রমিকরা পান্তা ভাতের পরিবর্তে নগদ টাকা পেতে চায়। পান্তা ভাত খাওয়ার বা খাওয়ানোর রেওয়াজ কৃষিক্ষেত্র থেকে উঠে গেলেও 'পান্তার বেলা' কথাটির ব্যবহার আজও রয়ে গিয়েছে। হয়তো আগামী দিনে হারিয়ে যাবে এই শব্দবন্ধ।

জলখাবার-খোরাকি : খোরাকি বাবদ তিরিশি টাকা করে দোবানি, বাবা কাজটা তুলে দে। দক্ষিণবঙ্গের সমাজ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ। বিষয়টি বহুদিন থেকেই সত্য। কৃষিক্ষেত্রে হাইব্রীড চাষ, অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্বে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের খাদ্যের অভাব ছিল প্রচুর। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ দুই বেলা পেট ভরে খেতে পেত না। সেদিনের কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাচুর্য থাকার কারণে পারিশ্রমিক ছিল খুব কম। তবে তখন শ্রমিকরা মালিকের বাড়িতে এক বেলা পেট ভরে খেতে পেত। এই খাওয়াটাই ছিল সেদিনের মানুছের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। কেবলমাত্র এক বেলা খাওয়ার আশায় বহু মানুষ অন্যের জমিতে শ্রম দিত। এই খাওয়ার পোশাকি নাম ছিল জলখাবার।

বর্তমান দিনে জলখাবার এর রেওয়াজ প্রায় উঠে যাচ্ছে। এর মূল কারণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। কৃষি বিপ্লবের কারণে এখন সারাবছর চাষ হয়। খাদ্য বস্তুর অভাব বিশেষ দেখা যায় না। পাশাপাশি একাধিক সরকারি প্রকল্পের কারণে সাধারণ মানুষের খাদ্যের অভাব আজ আর নেই। আজ যে মানুষ অন্যের জমিতে কাজ করতে যাচ্ছে তার বাড়িতেও খাদ্যের অভাব নেই। ফলে কাজ করতে গিয়ে জলখাবারের পরিবর্তে নগদ টাকা পেতেই সে বেশি আগ্রহী। বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষি শ্রমিকের সাপেক্ষে জলখাবার খাওয়া বা মালিকের সাপেক্ষে জলখাবার দেওয়া দুটো বিষয়ই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

এ যুগের কৃষি শ্রমিকরা জলখাবার না খেয়ে পরিবর্তে নগদ টাকা নিতে চাওয়ায়, কৃষি শব্দভাণ্ডারে একটি নতুন শব্দ যুক্ত হয়েছে। শব্দটি হল খোরাকি। খোরাকি হল সেই পরিমাণ টাকা যা জলখাবারের পরিবর্তে শ্রমিকরা দাবি করে। এটি পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত। যখন কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাচুর্য ছিল তখন শ্রমিকদের পারিশ্রমিকই যথাযথ ভাবে দেওয়া হত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একবেলা খাওয়ার বিনিময়েই শ্রমিকদের কাজ করতে হত। পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার কথা তারা ভাবতেই পারতো না। এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের খুব অভাব। তাই শ্রমিকের চাহিদাকে মূল্য দেওয়া ছাড়া মালিকের কোনো উপায় নেই। অধিকাংশ সময় বেশি মজুরি দিয়েই তাদের কাজে লাগাতে হয়। এই বিশেষ প্রেক্ষাপটে খোরাকি শব্দের উদ্ভব।

ফুরন কাজ : ফুরন কাজের সুবিধে অনেক ।

কৃষিক্ষেত্রে যখন শ্রমিকের প্রাচুর্য ছিল তখন ফুরন কাজের কোনো ধারণাই লোকের ছিল না। তখন শ্রমিককে কাজে নেওয়া হত তার কর্মক্ষমতার নিরিখে। যে বেশি কাজ করতে পারতো তাকেই কাজে নিত মালিকরা। একারণে শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে একেবারেই ফাঁকি দিত না। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতো বেশি পরিমাণে কাজ করার। যাতে পরের দিন মালিক আবার তাকে কাজে নেয়।

কিন্তু বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব দিনে দিনে বাড়ছে। শ্রমিকের চাহিদা বাড়ায় তাদের পারিশ্রমিক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু তারা ঠিকঠাক কাজ করে না। কারণ তারা জানে পরের দিনে তাদের কাজের অভাব হবে না। এক জায়গায় না হলে অন্য জায়গায় তারা কাজ পাবেই। এজন্য মালিকের লাভ-লোকসানের কথা একবারেই চিন্তা করে না শ্রমিকরা। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মালিক পক্ষ। শ্রমিকদের সীমাহীন ফাঁকির কারণে ফুরন কাজ প্রসঙ্গটির উদ্ভব। এক্ষেত্রে কাজ ও টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেয় না। মালিকরাও নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে।

কুটিয়াল : কুটিয়ালের ঘরের চাল আজ চাষার হাড়িতেও; কি আর বলবো!

ধান চাষের সঙ্গে কুটিয়াল কথাটি সংশ্লিষ্ট। এরা কৃষকদের থেকে ধান কিনে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে কৃষি অর্থনীতিতে কুটিয়ালদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান নিজেরাই সেদ্ধ শুকনো করতো এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বাজারে বিক্রি করতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধান সেদ্ধ শুকনো করার রেওয়াজ কৃষি সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে অনেক সামাজিক প্রেক্ষাপট জড়িত। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, কৃষক পরিবারের মহিলারা ঘরোয়া কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত রোজগারের আশায় অন্যান্য পেশায় প্রবেশ করছে। ফলে ধান সেদ্ধ করার জন্য যে পরিমাণ লোক বলের প্রয়োজন তার অভাব ঘটেছে। এর পাশাপাশি দেখা দিয়েছে জ্বালানি কাঠের অভাব। ধান সেদ্ধ শুকনো করার জন্য যে পরিমাণ জ্বালানি কাঠের দরকার একজন কৃষক সাধারণ ভাবে সেই কাঠ সংগ্রহ করতে পারে না। অথচ টাকা দিয়ে জ্বালানি কিনে ধান সেদ্ধ করলে লাভের আশা বিশেষ থাকে না। আবার অনেক কৃষকের ধান সেদ্ধ করার সমস্ত উপকরণ থাকলেও উপযুক্ত জায়গার অভাবে তা করতে পারে না। এখনকার স্থান অসংকুলানের যুগে অধিকাংশ কৃষক

পরিবারে ধান সেদ্ধ শুকনো করার মত উপযুক্ত খামার নেই। একাজে প্রকৃতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করতে হয় কৃষকদের। সেদ্ধ শুকনো করার সময় রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে চালের গুণমান ভালো হয় না। সেখানেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় কৃষকদের। এইসব কারণেই কৃষকরা ধান বিক্রি করে দেয় কুটিয়ালদের কাছে। কুটিয়ালরা ব্যবসা করার জন্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি রাখে। ফলে তাদের পক্ষে ধান সেদ্ধ করা কোনো সমস্যার নয়। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এইসব সমস্যা ছিল না। তখন কুটিয়ালও ছিল না। কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতিতে খুব আধুনিক শব্দবন্ধ কুটিয়াল।

কৃষক চাষ করবে, ঘরের চালের ভাত খাবে। এটাই ছিল সেদিনের সাধারণ রীতি। এখন কৃষককেও কুঠিয়ালের তৈরি চালের ভাত খেতে হচ্ছে। এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না জনৈক কৃষক। এদিকে বিশেষ কিছু করারও নেই তার। এই অবস্থায় তার কথায় একই সঙ্গে যন্ত্রণা ও অভিমানের সুর ফুটে উঠেছে।

ফড়ে : ফড়ের হাতে পড়ে সব্জির দাম আকাশ ছুঁয়েছে।

কুটিয়ালদের মত ফড়েরাও কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কতিতে নতুন অনুষঙ্গ। কৃষি দ্রব্যের বাজার অর্থনীতিতে এদের উদ্ভব। মূলত সব্জি বাজার জাত করে ফড়েরা। কৃষি বাজার, কৃষি দ্রব্যের হাটে এদের দেখতে পাওয়া যায়। কৃষিজ পণ্যের বাজার অর্থনীতি চালু হওয়ার আগে কৃষকরা উৎপাদিত ফসল নিজেরাই ভোগ করতো। ফসল বাজার জাত করার রেওয়াজও এখনকার মত ছিল না। পারস্পারিক বিনিময়ে মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করত কৃষকরা। সেদিন উৎপাদিত ফসলের পরিমাণও ছিল কম। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাজার চাহিদা বেড়েছে, বেড়েছে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ। ফলে কৃষিজ পণ্য নিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেছে কৃষি ক্ষেত্রের বইরের মানুষও। কুটিয়াল, ফড়ে প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের উদ্ভব একারণেই। কুটিয়ালরা ধান কিনে চাল তৈরির ব্যবসা করে, ফড়েরা মূলত সব্জি জাতীয় ফসল কেনাবেচার ব্যবসা করে।

সব্জির বাজারে ফড়েদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সব্জির দাম তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে। ফড়েরা নিজেদের ইচ্ছে মতো মুনাফা করতে চাইছে। ফলত এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। জনৈক সব্জি

ক্রেতার কথায় ধরা পড়েছে সেই বৃত্তান্ত। বাজার অর্থনীতিতে আকাশ ছোঁয়া কথাটি এমনিতে বেশ পরিচিত বিষয়। তবে ফড়ের হাতে পড়ে এই বাক্যবন্ধ বিশেষত কৃষিজ অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

জোন দে কাজ : এখন জোন সই হলেই পয়সা, কষ্ট করে কাজ করার লোক আজ আর নেই। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে কৃষক পরিবারের সমস্ত সদস্য কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকছে না। তারা জীবিকার বিকল্প মাধ্যম বেছে নিচ্ছে। ফলে চাষ জমিতে কাজ করার মত পর্যাপ্ত লোক সব কৃষক পরিবারের নেই। কিন্তু চাষ আবাদ বন্ধ করতেও পারছে না কৃষকরা। ফলত কৃষি শ্রমিকদের সাহায্য নিতে হচ্ছে তাদের। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষি শ্রমিকদের আঞ্চলিক নাম জোন। জোন দে কাজ করানো কথাটির উদ্ভব একারণেই।

কোনো কৃষকই কৃষিক্ষেত্রের কাজ জোন দিয়ে করাতে চায় না। কারণ বর্তমান দিনে জোন দিয়ে কাজ করাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, চাষ আবাদ করে সে পরিমাণ লাভ করা বেশ কষ্টকর। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে জোন দিয়ে কাজ করাতে বাধ্য হয় কৃষকরা। যার সুবিধা নেয় পেশাদার কৃষি শ্রমিকরা। তারা পারিশ্রমিক নিতে যতটা আগ্রহী কাজ করতে ততটা আগ্রহী নয়। ফলে জোন দিয়ে কাজ করানো এখন কৃষকদের পক্ষে একরকম যন্ত্রণার বিষয়।

কৃষি শ্রমিকদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থেকেই জোন সই , কাজ ধরে বসে থাকা কথাগুলির উদ্ভব। এক্ষেত্রে শ্রমিকরা কাজ করতে যায়, কিন্তু যথাযথ পরিমাণে কাজ করে না। চাকরিজীবী মানুষরা যেমন সই বা স্বাক্ষর করে টাকা পায় কৃষি শ্রমিকরাও তেমনই কাজে নাম লিখিয়েই টাকা পেতে চায়। কৃষি সংস্কৃতিতে মালিক পক্ষ বা সাধারণ সামাজিক কেউই শ্রমিকদের এমন মানসিকতাকে মেনে নিতে চায় না। কিন্তু কোনো মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সরাসরি কিছু বলতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমিকরা একজোট হয়ে ঐ মালিকের কাজ বয়কট করবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে মালিক পক্ষ। একপ্রকার বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকতে হয় মালিকদের।

দক্ষিণে লোক : দক্ষিণে লোক দিয়ে কাজ করানোর মজাই ছিল আলাদা
বছর কুড়ি আগেও দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতিতে দক্ষিণে লোক কথাটা অতি পরিচিত বিষয়

ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার কমতে শুরু করেছে। তখন উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি জেলার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রচুর শ্রমিকের দরকার হত। এর বিপরীত চিত্র ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায়। জেলার অধিকাংশ কৃষি জমি এক ফসলি হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি শ্রমিকরা কাজ পেত না। এই সুযোগটাই নিত উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া জেলার সম্পন্ন কৃষকরা। তারা বিশেষ বিশেষ কাজ যেমন ধান তোলা ঝাড়া, পাট তোলা প্রভৃতি করাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া জেলা থেকে শ্রমিক ভাড়া করত। এদের দিয়ে অনেক কম সময়ে, কম খরচে বেশি পরিমাণ কাজ করিয়ে নেওয়া যেত বলে সম্পন্ন কৃষকরা এদেরকেই বেশি পছন্দ করত।

বর্তমানে দক্ষিণে লোক ব্যবহারের রেওয়াজ কমতে শুরু করেছে। অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি, হাইব্রীড চাষ প্রভৃতির ফলে কৃষিকাজে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিতেও এখন সারা বছর কোনো না কোনো চাষ হচ্ছে। সেখানকার কৃষি শ্রমিকরাও সারা বছর কাজ পাচ্ছে। তাদের আর অন্য জেলায় গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে না।

এখন আর দক্ষিণে লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না। উদ্ধৃত বাক্যবন্ধে জনৈক কৃষক তাই কিছুটা আক্ষেপ করে কথাগুলি বলেছে। ভাষার সমাজতত্ত্বের দিকটি এখানে খুব স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

পেট ভাতা : পেট ভাতারে লোক এখন আর হাজারে একটাও মিলবে না।

এখন থেকে কুড়ি-ত্রিশ বছর পূর্বে দক্ষিণবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল বেশ করুণ। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত। পেট ভাতা শব্দটি তখনকার কৃষিক্ষেত্রে বেশ পরিচিত বিষয় ছিল। হত দরিদ্র মানুষ কেবলমাত্র একবেলা পেট ভরে খাওয়ার আশায় অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। আসলে গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই দুই বেলা ভাতের সংস্থান হত না। এর মূল কারণ তখন কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ছিল কম। অধিকাংশ জমি এক ফসলি বা দুই ফসলি হওয়ায় বছরের অনেকটা সময় কোনো চাষবাস হত না। তাছাড়া কৃষি কাজ ছাড়া অন্যান্য কজের সুযোগও বিশেষ ছিল না। ফলে গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে থাকত। সেদিনের সম্পন্ন কৃষকরা এই সুযোগটাই নিত বিশেষ ভাবে। কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাচুর্য

থাকায় টাকার বিনিময়ে তারা কাজ করাতে চাইত না। সম্পন্ন কৃষকদের সাপেক্ষে বিষয়টি ছিল বেশ লাভজনক।

বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি, রাসয়নিক সার, হাইব্রীড চাষ প্রভৃতির ফলে কৃষি ব্যবস্থায় উন্নতি এসেছে। কয়েকটি জেলা বাদে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সারাবছর চাষ হচ্ছে। বাজার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ছে উৎপাদন। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প চালু হয়েছে মানুষের মুখে সামান্য অন্ন সংস্থানের জন্য। এসবের মিলিত প্রভাবে সমাজ জীবন থেকে খাদ্যাভাব উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। ফলে এযুগের সহায় সম্বলহীন মানুষকেও আর কেবলমাত্র এক বেলা খাওয়ার আশায় অন্যের জমিতে বেগার খাটতে হয় না। পেটভাতা প্রসঙ্গটি তাই এযুগে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

মেন্দার : মেন্দার পাওয়ার আশা আজ আর না করাই ভালো।
একটা সময়ে দক্ষিণবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এমন ছিল যখন কৃষিকাজ ছাড়া খেটে খাওয়া মানুষের জীবিকা অর্জনের বিকল্প মাধ্যম ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে তখন শ্রমিকের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তখনকার অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক সারাবছর কাজ পেত না। কাজের নিশ্চয়তার জন্য তখন তারা সম্পন্ন কৃষকের সঙ্গে সারা বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। এক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণ ছিল খুব কম। কাজের নিশ্চয়তা থাকায় সেটাই মেনে নিত সেদিনের মেন্দাররা।

বর্তমানে জীবিকার বহু মাধ্যম তৈরি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে গ্রামের মানুষ কলকাতার কলকারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সমস্যা। সম্পন্ন কৃষকরা চাষ করতে বহু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় যারা আজও কৃষি শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করছে, বর্তমানে তাদের চাহিদা প্রচুর। ফলে বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে পারিশ্রমিকের পরিমাণ। পূর্বে মালিকরা নির্ধারণ করতো শ্রমিকের মজুরী। বর্তমানে শ্রমিকদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক দিতে হচ্ছে। পরিবর্তিত এই প্রেক্ষাপটে কোনো শ্রমিককে আর অল্প পারিশ্রমিকে মেন্দার হতে হচ্ছে না। সম্পন্ন কৃষকদের সাপেক্ষে বিষয়টা ক্ষতিকর হলেও সার্বিক বিচারে বেশ লাভজনক।

মেন্দার পাওয়ার সম্ভাবনা কম, এদিকে মেন্দার রাখার মধুর স্মৃতি জায়মান রয়েছে অনেক সম্পন্ন কৃষকের মনে। সেই মধুর স্মৃতি ও বর্তমানের রুক্ষ বাস্তবতার মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান তার প্রতিবিম্বন লক্ষ করা যাচ্ছে আলোচ্য বাক্যবন্ধে।

পানির দাম বা জলের দাম

এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে জমিতে কৃত্রিম জলসেচের কোনো ধারণা ছিল না। সেদিনের কৃষকরা জলের জন্য প্রকৃতির উপরেই সর্বাংশে নির্ভর করে থাকত। ধীরে ধীরে কৃত্রিম জলসেচের রেওয়াজ শুরু হয়। প্রথম দিকে ব্যবহৃত হত সেউতি। জল তোলা দমকল মেশিন আবিষ্কারের পর কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থায় বিপ্লব আসে। তৈরি হয় স্যালো মেশিনের অনুষঙ্গ।

কৃষিকাজে জলের দরকার সবার, কিন্তু জলসেচের মেশিন সবার নেই। যাদের নেই তারা টাকার বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে জল কিনে সেচ কাজ করে। এই ভাবেই পানির দাম বা জলের দাম কথাটির উদ্ভব। কৃত্রিম জলসেচ আবিষ্কারের পূর্বে এই ধরনের কথার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

জল কিনে সেচ দেওয়ার প্রসঙ্গেই ঘণ্টা পানি, ফুরন পানি, সিজন পানি কথাগুলির ব্যবহার হয়। স্যালো মালিকরা জমিতে জল দেওয়ার সময় ঘণ্টা হিসাবে টাকা নেয় বা সারা বছরের চুক্তিতে টাকা নেয়। কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা কৃষিজ শব্দভাণ্ডারকে এইভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কৃষি কেন্দ্রিক অর্থনীতির ও ভাষা-সংস্কৃতির বিশেষ দিক এগুলি। কারণ বহু মানুষ কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

ঘোরো চাল : পয়সা দিলেও এখন ঘোরো চাল মেলে না

কৃষিজ পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু হওয়ার পর ঘোরো চালের প্রসঙ্গ এসেছে। ঘোরো চালের বিপরীত শব্দটি হল মিলের চাল। একটা সময় কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ধান থেকে চাল তৈরি করে সেই চাল ব্যবহার করতো। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ফলে ধান থেকে চাল তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য ও ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। ফলে এযুগের অধিকাংশ কৃষক ধান বিক্রি করে চাল কিনে খাচ্ছে। ব্যবসায়িক

ভিত্তিতে ধান থেকে চাল তৈরি করছে একশ্রেণির মানুষ। বর্তমান যুগে তারা কুটিয়াল নামে পরিচিত। ধান থেকে চাল করা কুটিয়ালদের ব্যবসা হওয়ায় তাদের তৈরি চালের গুণমান ভালো হয় না। তাছাড়া চালের রং ভালো করার জন্য কুটিয়ালরা নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। যা মানুষের শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। কৃষকের ঘরে তৈরি চালে এই ধরনের কোন রাসায়নিক না থাকায় আধুনিক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ কৃষকের ঘরের চালকেই বেশি পছন্দ করে। বাজারে ঘোরো চালের দামও বেশি। বাজার অর্থনীতি জোরদার হওয়ার আগে ঘোরো চাল, মিলের চাল প্রভৃতির কোনো ধারণা ছিল না। এসবই আধুনিক কৃষিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার ফলাফল।

কৃষকরা নিজেরাই এখন চাল কিনে খাচ্ছে, এই অবস্থায় বাজারে ঘোরো চালের যোগান খুব কম। যথেষ্ট মূল্য দিয়েও তাই বাজারে ঘোরো চাল পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধৃত বাক্যবন্ধ এই সত্যেরই দ্যোতক।

হাট-খাজনা : হাট-খাজনা দিতেই এখন একগাদা পয়সা চলে যায়।
এযুগের বাজার অর্থনীতির অনেকটা জুড়ে আছে কৃষিজ পণ্য। এখন কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত এমন কোনো ফসল নেই যা নিয়ে ব্যবসা হয় না। উৎপাদিত সব জিনিসের বাজার চাহিদা আছে এবং তা বাজারজাত হচ্ছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজ শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন শব্দ।

কৃষিজ পণ্যের হাট দক্ষিণবঙ্গের অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি। পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে কোনো বিশেষ জায়গায়, খোলা মাঠে বা গাছের তলায় একত্রিত হত। এক জায়গায় বিচিত্র পণ্যের সমাহার হত বলে একে বলা হত হাট। কৃষকরা তাদের দ্রব্য নিয়ে হাটে যেত এবং বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতো। এর জন্য তাদের বিশেষ কোনো পয়সা খরচা করতে হত না। আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে এই রকম হাটের সংস্কৃতি দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। এখনকার হাট কোনো গ্রাম বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থার সম্পত্তি। সেখানে উৎপাদিত ফসল নিয়ে ব্যবসা করতে হলে কৃষকদের আলাদা খাজনা দিতে হয়। এই খাজনাই এযুগের হাট-খাজনা নামে পরিচিত। এমন হাট খাজনার ধারণা অতীতকালে দক্ষিণবঙ্গের কৃষকদের ছিল না।

প্রশ্ন হল, কেন এমন হাট-খাজনা কথার উৎপত্তি ? এর উত্তর লুকিয়ে আছে অনেক কিছুর গভীরে। এযুগের গ্রাম বাংলায় হাট করার মত ফাঁকা জায়গা বিশেষ পাওয়া যায় না। কৃষি বিপ্লবের কারণে গ্রামের মাঠে সারা বছর কোনো না কোনো ফসল চাষ হয়। পতিত জমি বলে এযুগে আর কোনো জমি ফাঁকা পড়ে থাকে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অধিকাংশ পতিত জমিতে বসবাস শুরু হয়েছে। এমন অবস্থায় হাট করার মত জমি নিঃস্বার্থ ভাবে ফেলে রাখা কোনো গ্রামের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে হাট তৈরি করছে কোনো গ্রাম বা সংস্থা। তারা উপযুক্ত খাজনার বিনিময়েই সেখানে অন্যকে ব্যবসা করতে দিচ্ছে। হাট-খাজনা কথার উদ্ভব এভাবেই।

হাট-খরচা : দু মোন কপি বেচেও হাট খরচার পয়সা হয় না, কি হবে চাষ করে।
একটা সময় পর্যন্ত কৃষকরা প্রায় স্বনির্ভর ছিল। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস তারা নিজেরাই উৎপাদন করে নিত। এখন অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের বাইরে অধিকাংশ বিষয়ের জন্যই এখন তারা খোলা বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদের কাছে নগদ অর্থের চাহিদা গিয়েছে বেড়ে। এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ কৃষকই হাট থেকে তাদের সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাকাটা করে। এই প্রেক্ষিতে বেড়ে গেছে হাট খরচার পরিমাণ। এদিকে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম হয়তো সেই তুলনায় বাড়েনি। এতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। উদ্ধৃত বাক্যবন্ধে সেই সমস্যারই অনুরণন আছে।

কাঁটা করা : হাটে পৌঁছেই আগে সব মাল কাঁটা করে নিবি।
এখন কৃষিজ পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কাঁটা করা বেশ পরিচিত বিষয়। কৃষিজ পণ্যের পাইকারি হাটে শব্দবন্ধটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁটা করা কথাটির অর্থ হল ওজন করা। পাইকারি হাটে জিনিস ওজন করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখে কেউ কেউ। ওজন করার জন্য খুব বড় মাপের পাল্লা ও প্রচুর বাটখারা নিয়ে বসে থাকে তারা। তারা পয়সার বিনিময়ে অন্যের দ্রব্য ওজন করে দেয়। এটাই তাদের ব্যবসা।পয়সার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পরিমাপের এই বিষয়টিকেও বলা হয় কাঁটা করা। কাঁটা করার জন্য এখন অনেকক্ষেত্রে সনাতন দাঁড়িপাল্লার বদলে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। যার সাহায্যে একসঙ্গে দশ মন বা তারও বেশি মাল একসঙ্গে ওজন করা যাচ্ছে।

কাঁটা করার অনুষঙ্গ প্রচলিত হওয়ার আগে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব কৃষকের বাড়িতে দাঁড়ি-পাল্লা, বাঁটখারা থাকত। কৃষকরা ফসল বাড়িতে ওজন করে হাটে নিয়ে যেত। এক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও ছিল। একসঙ্গে অনেক বেশি পরিমাণ মাল ওজন করতে প্রচুর সময় লাগত এবং কাজটিও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। হাটে অল্প টাকার বিনিময়ে কাঁটা করা বা ওজন করার সুবিধা চালু হওয়ায় কৃষকরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে। এখনকার কৃষক পরিবারে পাল্লা বাঁটখারা আর দেখতে পাওয়া যায় না।

হাটে কাঁটা করার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলে কৃষি সংস্কৃতি থেকে পাল্লা ধরা কথাটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। এক সঙ্গে অনেক মাল ওজন করা যথেষ্ট কষ্টের কাজ। শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল মানুষরা পাল্লা ধরতে পারে না। এই কাজে দরকার শক্ত সমর্থ মানুষের। শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে একটানা অনেক মাল ওজন করা সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে হাত ব্যথা হয়ে যাবে এবং কাজের ক্ষতি হবে। বর্তমান কৃষি সংস্কৃতিতে এই সমস্যা আর নেই।

পাষাণ ভাঙা : আগে পাষাণ ভেঙে নাও, তারপরে পাল্লায় মাল চাপাবে।

কম্পিউটার পাল্লা আবিষ্কারের পূর্বে কৃষিজ পণ্য পরিমাপের জন্য দাঁড়ি পাল্লাই ছিলো কৃষকদের শেষ ভরসা। কৃষি সংস্কৃতিতে খুব ভালো পাল্লা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখা যেত না। অধিকাংশ কৃষক সাধারণত কম দামি নিম্নমানের পাল্লাই বেশি ব্যবহার করতো। এই পাল্লার গুণমান ভালো না হওয়ায় পাল্লার দুই দিকের আধারের মধ্যে ওজনের সামঞ্জস্য থাকত না। তখন ওজনের সামঞ্জস্যের জন্য হালকা দিকে কোনো কিছুর ওজন চাপিয়ে দুই দিক সমান করা হত। মালপত্র ওজন করার আগে দোকানদারকে পাল্লার পাষাণ দেখাতে হত। তখন খরিদ্দাররাও বিষয়টির প্রতি খুব সচেতন ছিল। কারণ পাল্লার পাষাণ ভাঙা না হলে মাল ওজনে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কম্পিউটার পাল্লায় এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। তাই পাষাণ ভাঙা কথাটির ব্যবহার এযুগে খুব কম।

চটিওয়ালা : ছেলে হাটে চটি দেয়; আয় রোজগার ভাল

কৃষি হাটে যারা সব্জি বিক্রি করে তাদের চটিওয়ালা বলে। কোথাও কোথাও এরা সব্জিওয়ালা নামেও পরিচিত। চটিওয়ালারা কিন্তু কৃষক নয়। এরা পাইকারি বাজার থেকে সব্জি কিনে বাজারে বিক্রি করে।

ফসল উৎপাদনে এদের কোনো ভূমিকা নেই। কৃষকের উৎপাদিত ফসল নিয়ে এরা ব্যবসা করে এবং মুনাফা অর্জন করে। কৃষি সংস্কৃতির একটি অন্যতম অধ্যায় এরা, কিন্তু কৃষিকাজের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ নেই। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে চাষ আবাদ ক্ষতি হলে এদের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং সেক্ষেত্রে এদের লাভের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। কৃষকদের সবচেয়ে বেশি শোষণ করে এরাই। কৃষকদের থেকে অল্প টাকায় জিনিস কিনে বেশি টাকায় বিক্রি করে চটিওয়ালারা। কৃষিজ পণ্য নিয়ে ব্যবসা করে এরা লাভবান হয়; এদিকে কৃষকের দারিদ্র্য আর ঘোচে না।

আগেকার দিনে চটিওয়ালা কথাটা বা তাদের কৃত্যাদি তেমন প্রচলিত বিষয় ছিল না। তখন কৃষকরা অল্প জমিতে চাষ করতো, তাতে অল্প ফসল উৎপাদিত হত। ঘরে খাওয়ার জন্য রেখে দিয়ে যা অবশিষ্ট হত তাই বাজারে বিক্রি করার প্রশ্ন আসতো। এসব ক্ষেত্রে কৃষকরা উৎপাদিত দ্রব্য নিজেরাই মাথায় করে বা অন্য কোনোভাবে হাটে নিয়ে যেত এবং নিজেরাই পাল্লা ধরে খরিদ্দারের কাছে সরাসরি বিক্রি করতো। অর্থাৎ কোনো মিডিল ম্যান থাকতো না। এখন বাজার অর্থনীতি কৃষককে গ্রাস করায় চটিওয়ালার ধারণা তৈরি হয়েছে।

ক্ষেতে ক্ষেতে বিক্রি : কপি আমি ক্ষেতে ক্ষেতে বিক্রি করে দিই; ওসব আমার পোষায় না।
চটিওয়ালারা বা ফড়েরা কৃষিজ মাল, বিশেষত সব্জি জাতীয় ফসল পাইকারি বাজার থেকে কেনে আবার সরাসরি কৃষিক্ষেত্র থেকেও কেনে। সরাসরি জমি থেকে ফসল কেনা বেচা করা বোঝাতে ক্ষেতে বিক্রি কথাটি ব্যবহৃত হয়। ক্ষেতে বিক্রি করা কৃষক এবং চটিওয়ালা উভয়ের জন্য লাভজনক। এক্ষেত্রে কৃষককে ফসল বাজারে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হয় না। ফসল বাজারজাত করা ও বিক্রি করার জন্য আলাদা কোনো ঝামেলা সহ্য করতে হয় না বলে এখন কৃষকই জমি থেকে মাল বিক্রি করে দিতে বেশি আগ্রহী হয়েছে। চটিওয়ালা বা চটিদাররা এই সুযোগটাই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করছে। তারা তুলনায় কম দামে মাল কিনে বেশি মুনাফা পাচ্ছে।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইভাবে ক্ষেতে বিক্রির বিষয়টি সেভাবে প্রচলিত ছিল না। অতি দ্রুত বিষয়টা কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এর ভাল মন্দ দুটি দিকই আছে। অনেকক্ষেত্রে এতে বিশেষ

রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে কৃষকদের। সুবিধা হল সেইসব কৃষকদের যাদের কৃষিকাজে লোকবল কম। উদ্ধৃত বাক্যবন্ধে তেমনি এক সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষকের মানসিকতার প্রতিবিম্বন আছে।

বন্ধক রাখা : দুই বিঘে জমি বন্ধক রয়েছে ঘোষেদের কাছে।

মূল্যবান জিনিস বন্ধক রেখে টাকা নেওয়া মানুষের অনেক পুরনো প্রবণতা। সমাজের প্রায় সব স্তরে এর প্রচলন আছে। কৃষি সংস্কৃতিতেও বিষয়টি সমান ভাবে বয়ে চলেছে। হঠাৎ করে বেশি পরিমাণ টাকার দরকার পড়লে কৃষকরা কৃষি জমি বন্ধক রেখে টাকার সংস্থান করে। কৃষকদের কৃষি জমি বন্ধক রাখার প্রবণতা বেশি পুরনো নয়। কৃষি বিপ্লবের আগে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ কৃষি জমি ছিল এক ফসলি বা দুই ফসলি। জমিতে সারা বছর চাষ না হওয়ায় বাজারে জমির দাম বিশেষ ছিল না। কৃষি বিপ্লবের ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন অনেক বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে কৃষিজ পণ্যের বাজার চাহিদা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে গিয়েছে কৃষি জমির দাম। যখন জমির দাম কম ছিল তখন জমির বিনিময়ে কেউ টাকা ধার দিত না। জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় জমি বন্ধক রেখে টাকার সংস্থান করতে পারছে কৃষক সমাজ। যদিও কৃষক সমাজ জমি বন্ধক রেখে সাধারণভাবে টাকা নিতে চায় না। কারণ জমিকে তারা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। তবে বিপদে পড়লে তাদেরও কিছু করার থাকে না। আধুনিক কৃষি কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় জমি বন্ধক রাখা একটি বিশেষ অধ্যায়। বলা যায় এটি হত দরিদ্র কৃষকদের বিপদ থেকে উত্তরণের একটি অন্যতম উপায়। নিতান্ত বিপদে পড়লে কৃষকরা এর আশ্রয় নেয়

কৃষিজ সংস্কৃতি

এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি পর্বে আমরা আলোচনা করেছি সময় এবং আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে কৃষি পদ্ধতি, কৃষিজ অর্থনীতি প্রভৃতি কীভাবে বদলে গিয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করব সময়ের পরিবর্তনে কৃষিজ সংস্কৃতি কীভাবে বদলে গিয়েছে। এই স্তরে সময়ের অভিঘাতই শেষ কথা নয়। পরিবর্তিত কৃষি পদ্ধতি, কৃষি কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার নতুন মূল্যবোধ, মানুষের আধুনিক জীবনাচরণ, বিজ্ঞান মনস্কতা প্রভৃতিও গভীর রেখাপাত করেছে সংস্কৃতির উপর। আমরা বিভিন্ন অনুষঙ্গে সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের রূপরেখাকে ধরার চেষ্টা করব।

কৃষক পরিবারের গৃহস্থালী দ্রব্য

কৃষক পরিবারে একটা সময় পেয়ে, কোলা,খুঁচি, পালি, ধামা, কুলো, চাঙারি প্রভৃতি আসবাবপত্র নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল। প্রায় প্রতিটা কৃষক পরিবারে এগুলি স্বমহিমায় বিরাজ করত। বর্তমানে এসবের ব্যবহার খুব কমে গিয়েছে। এর পরিবর্তে জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি অত্যাধুনিক জিনিসপত্র। যেমন গামলা, ডেকচি, ড্রাম ইত্যাদি। নতুন এইসব আসবাবের কার্যকারিতা অনেক বেশি এবং এগুলি দীর্ঘমেয়াদি। নতুন এইসব জিনিস প্রচলিত হওয়ায় পুরানো জিনিসের ব্যবহার কমেছে।

সেদিনের কৃষি সমাজে খুঁচি, কুলো প্রভৃতি আসবাব নিয়ে নানা সংস্কারও প্রচলিত ছিল। যেমন চাল মাপা খুচিকে ঘরের লক্ষ্মী হিসাবে কল্পনা করা হত। কোনভাবেই খুঁচিকে ঘরের বাইরে বার করা হত না। মনে করা হত খুঁচি ঘরের বাইরে নিয়ে গেলে ঘরের লক্ষ্মীও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। আবার কুলো কৃষক পরিবারে গৃহস্থালির নানা কাজে ব্যবহৃত হত, কিন্তু কুলোর হাওয়া কোনো বাচ্চাকে খেতে দেওয়া হত না। মনে করা হত কুলোর বাতাস লাগলে অমঙ্গল হবে। এইসব সংস্কারের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও সেদিনের কৃষক সমাজ এগুলো জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছিলো। পুরানো আসবাবের ব্যবহার ক মে যাওয়ায় কৃষি সমাজ থেকে পুরানো সংস্কার গুলোও অনেক কমে গিয়েছে। শিক্ষার অগ্রগতির ফলে এযুগে মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক সমাজও এর বাইরে নয়। পুরানো সংস্কার কমে যাওয়ার পিছনে বিজ্ঞানের প্রভাবও অস্বীকার করার নয়।

ধামা, পালি, খুঁচি প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি বেতের তৈরি। দীর্ঘ ব্যবহারে এগুলি ভেঙে যায়। দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম গুলোতে এমন অনেক মানুষ ছিল যারা এইসব ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় ঐ পেশার মানুষরা কাজ হারিয়েছে। তখন বহু মানুষ পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেতে র পাত্র সারাই করতো। তারা রাস্তা দিয়ে সুর করে ‘‘ ধামা পালি সারাই আছেএএএ’’ হাঁকতে হাঁকতে যেত। কৃষি পরিবারের মেয়েরা বাড়ির বেতের পাত্র ভেঙে গেলে প্রতিনিয়ত ঐরকম ডাকের প্রার্থনা করতো। এখনকার পরিবর্তিত কৃষি সংস্কৃতিতে বেতের পাত্র সারাই করার লোক দেখতে পাওয়া যায় না, তাদের সুরেলা হাঁকও শুনতে পাওয়া যায় না। আধুনিক সভ্যতা একদিকে যেমন জীবিকার বহু মাধ্যম তৈরি করেছে অন্যদিকে পুরানো অনেক জীবিকার মাধ্যম নষ্ট করে দিয়েছে। ধামা, কুলোর

ব্যবহার অপ্রচলিত হওয়ায় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাক্য-বাক্যবন্ধও অপ্রচলিত হয়ে আসছে। যেমন—এক ধামা চালির খিদে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো প্রভৃতি। আগে কৃষক পরিবারে পরিমাপের একক হিসেবে ধামা, কুলো প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। কৃষক বধূরা পাশের বাড়ির থেকে চাল বা আটা ধার করতো খুঁচির হিসেবে—দিদি এক খুঁচি চাল ধারা দাও না। কৃষকরা ধান বা ওই জাতীয় কোনো পণ্য লেনদেন করতো ধামার মাপে। এখন এসবই অপ্রচলিত প্রায় বিষয়।

ধান সেদ্ধ করার উপকরণ ও শব্দকথা

বর্তমান কৃষক পরিবারে বাড়িতে ধান সেদ্ধ করে চাল করার রেওয়াজ অনেক কমে গিয়েছে। সীমিত পরিসরে এখন বাড়িতে যেটুকু ধান সেদ্ধ শুকনো করা হয় তাতে পুরানো পদ্ধতি, পুরানো দ্রব্যাদির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। যেমন চুলো, ম্যাসলা, ডেকচি, চেটা ইত্যাদি। ধান সিদ্ধ করা চুলো সেদিন পর্যন্ত কৃষক পরিবারে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। প্রায় সব কৃষকের বাড়িতে এই উনুন থাকত এবং সেটি সারা বছর যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হত। যখন তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হত না তখন ধান ওঠার মরসুম শুরু হতেই নতুন করে চুলো পাতিয়ে নেওয়া হত। এই চুলো যে সে পাততে পারতো না। যারা এ ব্যাপারে দক্ষ থাকতো সমাজে তাদের বিশেষ মান্যতা ছিল। ধান সেদ্ধ করার পাশাপাশি বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে রান্না করা হত ঐ উনুনে। এখন ধান সেদ্ধ করার উনুন প্রায় বাড়িতেই আর দেখতে পাওয়া যায় না।

পূর্বে ধান সেদ্ধ করার পর রৌদ্রে দেওয়ার জন্য চেটা ব্যবহার করা হত। এখন তার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে নাইলনের নেট। চেটার ব্যবহার আজ আর নেই। ধান সেদ্ধ শুকনো করার সঙ্গে চেটা তৈরি করা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জুড়ে ছিল। এর জন্যে খেজুর গাছের পাতা কেটে জলে ভিজিয়ে রাখা হত। নির্দিষ্ট সময়ের পর তা জল থেকে তুলে শুকনো করে বিশেষ পদ্ধতিতে বুনে চেটা করা হত। এই কাজ সবাই পারতো না। চেটা বুনতে গেলে বিশেষভাবে শিখতে হত কাজটি। বাড়ির বয়স্কা মহিলারাই কাজটি জানত এবং তারাই করতো। তাদের থেকে ধীরে ধীরে শিখে নিত কৃষক পরিবারের মেয়ে ও বধূরা। এখনকার মেয়েরা এই কাজ করতে জানেই না বা জানার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না। বিকল্প মাধ্যম তৈরি হওয়ায় এইসব পুরনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে বর্তমান কৃষক সমাজ।

ধান শুকনো করার পাশাপাশি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও চ্যাটার ব্যবহার ছিল গ্রামে গঞ্জে। তখন আধুনিক ধরনের মাদুর বা এই জাতীয় বিষয়ের প্রচলন ছিল না। বাড়িতে অতিথি এলে চ্যাটা বিছিয়ে বসতে দেওয়া হত। কোনো কোনো বাড়িতে রাত্রে ঘুমানোও হত চ্যাটা বিছিয়ে। উল্লেখ্য ধান শুকোনোর চ্যাটা ও বসা বা শোয়ার কাজে ব্যবহৃত চ্যাটার মধ্যে আকার প্রকারগত পার্থক্য ছিল। এখন বসার কাজে চ্যাটার ব্যবহার না থাকায় চ্যাটা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বাক্যবন্ধ অপ্রচলিত হতে চলেছে। যেমন—তোল চ্যাটা হবে না গান। তখন গানের আসরে বা উৎসবে অনুষ্ঠানে চ্যাটায় বসতে দেওয়া হত সকলকে। কোনো কারণে গৃহকর্তা চটে গিয়েছে এবং চ্যাটা তুলে নিয়ে গান বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছে।

ম্যাসলা ধান সিদ্ধ শুকনো করার একটি পুরানো উপকরণ। পূর্বে গরুকে যে রকম পাত্রে খেতে দেওয়া হত সেই রকম পাত্রের নিচের দিক মাটিতে পুঁতে রাখা হত। ধান ভেজানোর কাজ করা হত এই পাত্রে। এখন ধান ভেজানোর জন্য চৌবাচ্চা ব্যবহার করছে কৃষক সমাজ। চৌবাচ্চা ইট বালি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে নষ্ট হওয়ার ভয় কম। পুরানো ধরনের ম্যাসলা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে মানুষের জীবন ব্যবস্থা এত আধুনিক হয়েছে, নিত্য নতুন ব্যবহার্য জিনিস এত সহজলভ্য হয়েছে যে পুরানো পদ্ধতি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ থাকছে না।

কোনো সন্দেহ নেই পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজ নিজেদের পরিবর্তন করছে খুব দ্রুত। কৃষি পদ্ধতি, কৃষিজ উপকরণ প্রভৃতিও তাই অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিনিয়ত বদলে বদলে যাচ্ছে কৃষক সমাজের চালচিত্র। বর্তমানে কৃষক সমাজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশ বছর পরে আর সেখানে থাকবে না সেটা ধরেই নেওয়া যায়। পূর্বের অনেক সংস্কৃতি যেমন আজ অপ্রচলিত তেমনই আজকের বহু প্রসঙ্গ সেদিন হয়ে যাবে মূল্যহীন। কৃষিজ উপকরণের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান ভাবে প্রযোজ্য।

কৃষক পরিবারের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের রেওয়াজ

রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের আধুনিক স্টোভ সহজলভ্য হওয়ার আগে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের অধিকাংশ

মানুষ কাঠের উনুনে রান্না করতো। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা ছিল সেদিনের কৃষি সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ। দৈনন্দিন রান্না ও ধান সিদ্ধ করার কাজে প্রচুর কাঠ লাগত। বর্ষাকালে শুকনো কাঠের চাহিদা বাড়ত বেশি। বিশেষ করে বর্ষাকালের উদ্দেশ্যে সারা বছর কাঠ সংগ্রহ করত কৃষক পরিবার। প্রায় প্রতিটা কৃষকের বাড়িতে থকত কাঠচালা। যেখানে শুকনো জ্বালানি কাঠ সংরক্ষিত থাকতো। এখনকার কৃষকদের বাড়িতে আর কাঠচালা দেখতে পাওয়া যায় না। কাঠ সংগ্রহ করার রেওয়াজের সঙ্গে মিশে আছে কৃষি সংস্কৃতির আরও অনেক বিষয়। যেমন গোবর কুড়ানো, ঘুঁটে কুড়ানো, গোঁজা কুড়ানো, নাড়া কাটা, বাসনা কাটা ইত্যাদি। সেদিনের কৃষক পরিবারের ছোটো বাচ্চারা যাদের বাড়িতে গরু নেই তারা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মাঠে মাঠে গোঁজা, ঘুঁটে, গোবর ইত্যাদি কুড়িয়ে বেড়াতো। মাঠ থেকে ধান কাটা হয়ে গেলে ধানের নাড়া কেটে, কলা বাগান থেকে বাসনা কেটে বাড়ি আনতো তারা। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বা ছুটির সময় এই কাজ করতে উৎসাহের কোনো অভাব থাকত না কৃষক পরিবারের বাচ্চাদের। বরং এইসব কাজে বিশেষ আনন্দ পেত তারা। এখন এসব বিষয় গ্রামের বাচ্চাদের কাছেও অপরিচিত প্রায়। গোজা কুড়াতে যাবিনে—বললে আজকের গ্রামের বাচ্চাদের অধিকাংশই তার কোনো অর্থ বুঝতে পারবে না।

আজকের পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গিয়েছে। দৈনন্দিন রান্নার কাজে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার দ্রুত কমছে। রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের আধুনিক স্টোভ সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ এই সুবিধাটাই সাদরে গ্রহণ করেছে। তাদের আর বর্ষাকালের জন্য কাঠ সংরক্ষণের দরকার নেই। কাঠ চালারও আর তাই দরকার পড়ছে না। খুব কম পরিবারেই কাঠচালা দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার। জ্বালানি কাঠের বিষয়ে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি এক নয়। কলকাতা ও তৎসংলগ্ন জেলায় জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমে গেলেও কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলোতে এর ব্যবহার আজও আছে। তবে সেখানেও ঘুঁটে কুড়ানো, নাড়া কাটা, গোঁজা কুড়ানোর রেওয়াজ খুব কম। মানুষ এখন খুবই ব্যস্ত। ঘুঁটে, নাড়া, গোঁজা এসব কুড়ানোর মত সময় কৃষক পরিবারের বাচ্চাদেরও নেই। তারা সকাল বিকাল পড়তে বসে, পড়তে যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলার এক ফসলী জমিতে আজও ধান কাটার পর নাড়া শুকনো হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু কেটে নেওয়ার কেউ নেই। আবার কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ জমিতে সারাবছর কোনো না কোনো চাষ হয়। তাই কেউ চাইলেও

ঐসব জমি থেকে নাড়া কাটতে পারে না। গ্রাম বাংলায় গরু পোষার রেওয়াজ কমে যাওয়ায় মাঠে আর পুরানো দিনের মত গরু চরেনা। তাই মাঠে আর গোবর পড়ে থাকে না। তাই ঘুঁটে কুড়ানো, গোঁজা কুড়ানো এসবের আর তেমন প্রশ্ন আসে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোবর কুড়ানো, গোঁজা কুড়ানো আজ আর এসবের তেমন প্রচলন না থাকলেও অনেক কৃষক পরিবারে অদ্যাবধি জ্বালানি সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে পাটকাঠির গাদা দেওয়ার বিষয়টি প্রচলিত আছে, কমবেশি প্রচলন রয়েছে গোবর কাঠি দেওয়ার প্রবণতাও।

কৃষক সমাজের খাদ্যাভাস

খাদ্যাভ্যাস মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক বিশেষ অধ্যায়। কৃষক সমাজের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে কৃষি সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস। বিভিন্ন শব্দকথায় সেই ইতিহাসের রেখাপাত লক্ষ করা যায়। যেমন হড়া পোড়া, আলু পোড়া, বিভিন্ন দানা শস্য ভাজা ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। হড়া পোড়া সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আরও কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মানুষের খাদ্য সংকট অনেক কম। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। আবার সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পরিবর্তন ঘটছে। যার প্রভাব পড়েছে কৃষক সমাজের খাদ্যাভ্যাসে। বর্তমান সময়ের মত এত পরিমাণ ফাস্ট ফুড, বিচিত্র প্যাকেট খাবার পূর্বে ছিল না। সেদিনের খাদ্য তালিকাও ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত। ফলে ক্ষুধা নিবারণের জন্যে মানুষকে বিচিত্র উপায় বার করতে হয়েছিল। বসন্তকালের সন্ধ্যাবেলা কৃষক পরিবারের বাচ্চাদের হড়া পোড়া করতে দেখা যেত প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া আলু, কাঁঠালের বীচি বা হাঁসের ডিম পুড়িয়ে খাওয়া ছিল অতি পরিচিত ব্যাপার।

কৃষকরা আলু জমি থেকে আলু তুলে নেওয়ার পর গ্রামের বাচ্চারা কৃষকদের বাদ দেওয়া ছোটো ছোটো আলু কুড়িয়ে নিয়ে আসত। তারপর ঐ আলু ধুয়ে উনুনের গরম ছাই এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। একটা

সময় পর আল পুড়ে যেত। তারপর তা তুলে খোসা ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে খেত। এই ভাবে কাঁঠালের বীচি পুড়িয়ে খাওয়ার রেওয়াজও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। হাঁসের ডিম পুড়িয়ে খাওয়ার বৃত্তান্তও রয়েছে। সেদিনের গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটা পরিবার বাড়িতে হাঁস প্রতিপালন করতো। পাল পাল হাঁস চরে বেড়াত গ্রামের পুকুরে। মাঝে মাঝেই দেখা যেত কিছু কিছু হাঁস সন্ধ্যায় বাড়িতে না ফিরে পুকুরেই রাত কাটাতো এবং পুকুর পাড়ে ডিম পেড়ে দিত। খুব ভোরে উঠে গ্রামের বাচ্চারা পুকুর পাড় থেকে ঐ ডিম কুড়িয়ে নিত। তারপর সন্ধ্যায় ডিমের গায়ে কাদা মাখিয়ে উনুনের গরম ছাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলে অল্প সময়ে ডিম সেদ্ধ হয়ে যেত। ডিমের গায়ে কাদা থাকার কারণে পোড়ার ভয় থাকত না।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির এই অধ্যায় গুলো বর্তমানে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। এখন বাজারে সকাল সন্ধ্যার টিফিনের জন্যে এত বিচিত্র খাবার সহজলভ্য হয়েছে যে কোনো বাচ্চাকে আর কাঁঠালের বীচি, আলু বা ডিম পুড়িয়ে খেতে হয় না। তারা অল্প টাকার বিনিময়ে আধুনিক খাবার খেয়ে টিফিন খাওয়ার কাজ মিটিয়ে নেয়। সন্ধ্যা বেলা গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটা বাড়িতে চা বিস্কুট মুড়ি খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে। যা পূর্বে ছিল না। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বড়িতে চা তৈরি করে খাওয়া সেদিনের কৃষক সমাজ বিলাসিতা বলে মনে করতো। যা আজ অতি সাধারণ ব্যাপার। পূর্বে এই খাদ্যাভ্যাস না থাকায় বাচ্চারা ক্ষুধা নিবারণের বিকল্প মাধ্যম তৈরি করে নিয়েছিল। এযুগে তার প্রয়োজনীয়তাটাই নেই। তাই এখনকার বাচ্চারা ঐ ধরনের খাবারের কথা শুনলে অবিশ্বাস করবে। তাছাড়া কাঁঠালের বীচি পুড়িয়ে খাওয়ার রেওয়াজ একেবারে না থাকলেও রান্না করে খাওয়ার অভ্যাস কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুকুর পাড়ে হাঁসের ডিম খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ হাঁস প্রতিপালনের রেওয়াজ এযুগে কমে গিয়েছে। ফলে হাঁসের ডিম এখন আর সহজলভ্য নয়। যথেষ্ট দাম দিয়ে তবে হাঁসের ডিম কিনতে হয়। তাই হাঁসের ডিম পুড়িয়ে খাওয়ার মত বিলাসিতা দেখানোর সুযোগ আজ নেই।

কাঁঠালের বীচি পুড়িয়ে খাওয়ার পাশাপাশি রান্না করে খাওয়াও তখন পরিচিত বিষয় ছিল। সব্জি রান্নার সময় যেমন আলু ব্যবহার করা হয় তেমনই কাঁঠালের বীচিও ব্যবহার করা হত। আলুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হত এমন নয়, আলুর সঙ্গেই এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আসলে তখন সারাবছর যথেষ্ট পরিমাণে সব্জি পাওয়া যেত না বা পাওয়া গেলেও দাম বেশি হওয়ার কারণে কিনে খাওয়ার সামর্থ্য সবার থাকত

না। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এইসব খাবার খেতে হত কৃষকদের । বর্তমান সময়ে সারাবছর বাজারে অল্প টাকায় সব্জি পাওয়া যায়। আবার মানুষের দারিদ্র্যের পরিমাণও এখন অনেক কমে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে কাঁঠালের বীচি রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না আর।

পান্তা ভাত খাওয়া কৃষক সমাজের অনেক পুরানো অভ্যাস। কিছু দিন আগে পর্যন্ত অধিকাংশ কৃষক পরিবারে এটা ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। তখন পান্তা খাওয়ার জন্যে বিশেষ কোনো উপকরণের দরকার হত না কৃষকদের। আগের রাতের অবশিষ্ট তরকারি অল্প পরিমাণে হলেই তা দিয়ে সকালের পান্তা ভাত খাওয়ার কাজ সেরে নেওয়া যেত। অনেক সময় শুধু কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, বা লবণ মেখেই ভাত খেয়ে নিত কৃষক পরিবারের সকল সদস্য। কৃষক সমাজের এই অভ্যাস থেকেই পান্তার বেলা, আমানি ঠেলে পান্তা, গরিবের কথা পান্তায় ফলে প্রভৃতি কথা প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমানে পান্তাভাত খাওয়ার রেওয়াজ খুবই কমে গিয়েছে। এর ফলে পান্তার বেলা, আমানি ঠেলে পান্তা প্রভৃতি কথা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এসব কথা আর কতদিন প্রচলিত থাকবে। সমাজতত্ত্বের সাধারণ পাঠ থেকে আমাদের মনে হয়, অনন্ত আরও কয়েক দশক এসব কথা আমাদের সমাজ ভাষায় অবলীলায় বর্তমান থাকবে। তারপর এগুলো হয়তো ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়বে।

বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও কৃষি সংস্কৃতি

মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত ভাষিক প্রকাশ প্রবাদ-প্রবচন সমূহ। মানুষের জীবন যাপন, সংস্কৃতি, মানব সভ্যতার প্রাত্যহিক চালচিত্রের মধ্যে থেকে তৈরি হয় প্রবাদ-প্রবচনগুলি। কৃষিকাজ দক্ষিণবঙ্গের অনেক পুরানো ঐতিহ্য। তাই কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচনের সংখ্যা প্রচুর। যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে কৃষি সংস্কৃতির অনেক অজানা ইতিহাস। আমরা সেই ইতিহাসের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'--ঢেঁকিতে ধান ভানা একদা কৃষক সমাজে বহু প্রচলিত বিষয় ছিল। গ্রাম্য মানুষের নিত্য দিনের সঙ্গী ছিল ঢেঁকি। ধান ভানা, চিড়ে কোটা, চাল থেকে আটা তৈরি করা ইত্যাদি কাজে ঢেঁকি সবসময় ব্যবহৃত হত। ঢেঁকিকে কেন্দ্র করে অনেক শব্দকথা প্রচলিত ছিল, যেমন পাদ দেওয়া, লোটের কাঠ, লোট। ঢেঁকির ব্যবহার বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে ঢেঁকি সংক্রান্ত শব্দ গুলো। এযুগের অনেক লোকের কাছেই লোটের কাঠ, লোট কথাগুলি একেবারেই অচেনা। উল্লেখিত প্রবাদটিও একটা সময় পর্যন্ত প্রচুর ব্যবহৃত হত। ঢেঁকির ব্যবহার কমে যাওয়ায় এর ব্যবহারও কমে গিয়েছে।

'যে এলো চষে সে রইলো বসে, নাড়া কাটাকে ভাত দিতে হবে পাথর ঠেসে'- প্রবাদটির মধ্যে জড়িয়ে আছে লাঙল চষা, নাড়া কাটা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে কোনো কৃষিজ কাজের প্রতি কৃষি সমাজের কেমন মনোভাব। যারা লাঙল চষার মত কষ্টের কাজ করে তাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি থাকে সকলের। নাড়া কাটার কাজে কষ্ট কম বলে নাড়া কাটাদের প্রতি আলাদা করে কোনো সহানুভূতি দেখানো হয় না; বরং কিছুটা তাচ্ছিল্যই করা হয় তাদের। আলোচ্য প্রবাদ বাক্যে এই তাচ্ছিল্যেরই প্রতিবিম্বন আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ পরবির্তন হয়নি আজও। এখনও কর্মঠ, উপার্জনক্ষম ছেলেরাই কৃষক পরিবারে সমাদৃত হয়, অন্যদের কমবেশি হেলাফেলার শিকার হতে হয়।

'উঠবি তো ছেলে ধরবি, বসবি তো বেতে কাটবি ' নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম কৃষি সংস্কৃতির মূল কথা। অহেতুক সময় কাটানোর সুযোগ সেদিনের কৃষক পরিবারের কোনো সদস্যের ছিল না। সারাদিন কোনো না কোনো কাজের মধ্যেই তাদের দিন কেটে যেত। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিপণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়, অন্য অর্থে কৃষক সমাজে বাজার অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ ছায়াপাত ঘটায় কৃষকরাও এখন ক্রমশ নাগরিক সুলভ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এতে আরাম আয়েশের শিকার হচ্ছে তারা। দুপুর গড়াতে না গড়াতে মাঠে গিয়ে গা ঘোর সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা তখন কৃষক মাত্রের জীবনের প্রায় নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। এখন অনেক কৃষকই বিকেল বেলায় জমিতে পা দেয় না। তারা অন্যদের মতো দুপুরের বিশ্রাম সেরে সন্ধ্যার আগে আগে স্থানীয় বাজারে গিয়ে হাজির হয়; অতঃপর চা-বিস্কুট খায়, টিভি দেখে আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে। পরিবর্তিত এই প্রেক্ষিতে প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্ধৃত প্রবাদ-প্রবচনটি।

গ্রাম্য কৃষকদের অবসর যাপন

বর্তমান সময়ে মানুষের অবসর যাপনের অনেক মাধ্যম। এযুগের মানুষ টিভি, স্মার্টফোন, সিনেমা প্রভৃতির মাধ্যমে রাঙিয়ে নিয়েছে তাদের অবসরকে। তিরিশ চল্লিশ বছর আগে গ্রাম্য কৃষকদের অবসর যাপনের এত মাধ্যম ছিল না। কিন্তু তাই বলে তারা অবসর যাপন করত না এমনটা নয়। সেদিনের কৃষকরা তাদের মত করে অবসর সময়কে সাজিয়ে নিয়েছিল। আমরা দেখার চেষ্টা করব সেদিনের কৃষকদের অবসর বিনোদনের মাধ্যমগুলি কেমন ছিল।

সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির বৈঠকখানা ছিল সেদিনের কৃষকদের অবসর যাপনের বিশেষ জায়গা। তখন প্রায় সব গ্রামে কয়েকটি বৈঠকখানা থাকত। সারাদিন জমিতে কাজ করার পর সন্ধ্যার পরে গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হত কোনো না কোনো বৈঠকখানায়। সেখানে বিভিন্ন গল্প গুজবে মেতে উঠত তারা। গল্পের বিষয় কখন রূপকথা, কখন কৃষিকাজ বা অন্যান্য আরও কিছু। গল্পের মাঝে মাঝে চলত বিভিন্ন দরকারি কাজ। যেমন বেতে কাটা, জাল বোনা, দরকারি অস্ত্রে ধার দেওয়া প্রভৃতি। পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন খেলার রেওয়াজ। যেমন ষোলো গুটি, বাঘ বন্দি, তাস, পাশা, দাবা। এসবের মধ্যে দিয়ে কেটে যেত সন্ধ্যার পরবর্তী কয়েকটি ঘণ্টা।

সন্ধ্যায় বৈঠকখানার আড্ডাই কৃষকদের অবসরের শেষ কথা নয়। তখন সারাবছর জমিতে চাষ হত না। বিশেষ বিশেষ মরশুমে চাষ হত। বাকি ফাঁকা সময় অনেক গ্রাম্য খেলায় মেতে উঠত কৃষকরা। যেমন ঘড়েল চু, গাদি বা ঘর ঝাঁপ, ডাং গুলি, গাছ মাছ, ঢেকিল খেলা, গুলি বা মার্বেল খেলা। এসবের পাশাপাশি বারমাসে তের পার্বণ তো ছিলই। সঙ্গে থাকতো যাত্রা, লোকগান, নবান্ন প্রভৃতির বিশেষ আয়োজন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি অনেক পাল্টে গিয়েছে। গ্রাম বাংলায় এখন আর বৈঠকখানা দেখতে পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বৈঠকখানা গুলো পরিণত হয়েছে বাসঘরে। আলাদা করে বৈঠকখানা করে রাখার সুযোগ এখনকার কৃষকদের নেই। ফলে বৈঠকখানা কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। কৃষি

বিপ্লবের কারণে এখন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় সারাবছর চাষ আবাদ হয়। ফলে অনেক গ্রাম্য খেলা হারিয়ে গিয়েছে। যেমন ঘড়েল চু, গাদি ইত্যাদি। এই সব খেলার জন্য দরকার উন্মুক্ত খোলা মাঠ। সারাবছর চাষের কারণে উন্মুক্ত মাঠ পাওয়া এযুগে কঠিন। তাছাড়া এযুগে অবসর বিনোদনের এত বিচিত্র মাধ্যম প্রচলিত হয়েছে যে অবসরের জন্য আর কাউকে মাঠে যেতে হয় না। ঘরে বসে হাতের কাছে অনেক কিছু পাওয়া যায়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির অনিবার্য অভিঘাত লক্ষ করা যাচ্ছে কৃষি সংস্কৃতিতে। হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কৃষি কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান।

এখনকার দিনের কৃষকরাও সকাল সন্ধ্যা খবরের কাগজ পড়ে , টিভিতে খবর শোনে, মোবাইলে ইউটিউব ভিডিয়ো দেখে, গান শোনে। এযুগের কৃষক পরিবারের বাচ্চাদের ঢেকিল বা মার্বেল খেলতে দেখা যায় না। তারা মোবাইলে বিভিন্ন গেম খেলে সময় কাটায়। এযুগের কৃষক পরিবারের বাচ্চারা ঢেকিল খেলা কী সেটাই জানে না। তার প্রয়োজনীয়তাও নেই। বিকল্প অনেক মাধ্যম প্রচলিত হয়েছে। এতে তাদের ভাষারীতিতে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে। বালঢেকিল, ঢেকিল, পিল, ভটকা, ফক্কা, আপ্পু ইত্যাদি শব্দ, শব্দবন্ধ এখন নিতান্ত অপ্রচলিত বিষয়।

কৃষিজ উৎসব

নবান্ন

নবান্ন উৎসব বাঙালির বড় প্রাণের উৎসব। নতুন চালের আটা তৈরি করে সেই আটা থেকে পিঠে তৈরি করে নবান্ন উৎসব পালন করত আপামর বাঙালি সমাজ। বাড়িতে তৈরি পিঠের ভাগ থেকে বঞ্চিত হত না কাক পাখিরাও। কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালি জীবনে নাবান্নের প্রভাব ছিল প্রচুর। বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর নবান্ন কবিতায় লিখেছেন--" আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফেরাতে নাই।" কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালি জীবনে নবান্নের প্রভাবের কারণেই বহু কবি সাহিত্যিকের কলম আলোড়িত হয়েছে এর দ্বারা। বিজন ভট্টাচার্যের " নবান্ন" সেই আলোড়নের উৎকৃষ্ট ফলাফল।

নবান্ন উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে বসত নবান্নের মেলা। গ্রাম্য মানুষ মেলার কয়েকদিন আনন্দে মেতে উঠত। অনেক রকম গ্রাম্য বা লৌকিক খেলার অনুষ্ঠান হত সেদিনের নবান্ন মেলায়। মোরগ

লড়াই, গরুর গাড়ির দৌড়, বড় পুকুরে হাঁস ছেড়ে দিয়ে সেটা ধরার প্রতিযোগিতা, বড় কলাগাছের একেবারে মাথায় মিষ্টির হাঁড়ি বা টাকা রেখে , গাছের গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়ে গাছে উঠে তা পাড়ার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। গ্রাম্য কৃষক সমাজ সারাবছর এই নবান্ন উৎসবের জন্য গভীর ভাবে অপেক্ষা করত। গৃহস্থ বধূরা মেলা থেকে কিনতো কাঁচের চুড়ি, বাচ্চাদের কোমরে দেওয়া হত ঘুনসি, কবিগানের আসর বসত মেলা প্রাঙ্গণে। আসলে সেদিনের কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালি জীবন ছিল একটানা, একঘেয়ে, উত্তেজনাহীন। খাদ্যাভাব ছিল প্রচুর। তখন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জমি ছিল এক ফসলি বা দুই ফসলি। ফলে অগ্রহায়ণ মাসে ওঠা নতুন ধানকে ঘিরে আশা আকাঙ্ক্ষার নানা স্বপ্নজাল রচনা করত সেদিনের বাঙালি সমাজ। নবান্ন উৎসব সেই স্বপ্ন জালের ফলিত রূপ।

বর্তমান সময়ে নবান্নকে ঘিরে বাঙালির সেই উন্মাদনা আর নেই। এযুগে মানুষের অবসর বিনোদনের অজস্র মাধ্যম। বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মেলার জন্য কাউকে আর অপেক্ষা করতে হয় না। সারা বছর কোনো না কোনো উৎসব বাঙালি জীবনে জড়িয়ে থাকে। নবান্ন উৎসব এখন কেবলমাত্র গৃহস্থের পিঠে খাওয়ার উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের মাল্টিমিডিয়া আর ইন্টারনেটের যুগে কে আর কবিগান শুনবে বা কেই বা সারাবছর ধরে বাড়িতে মোরগ পুষে তাকে লড়াইয়ের উপযুক্ত করে তৈরি করবে মেলায় মোরগ লড়াই জেতার জন্য। স্বীকার করতে হবে বর্তমানের আধুনিক জীবন ব্যবস্থা মানুষকে অনেক উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। তবে একথাও সত্য মানুষ দিনে দিনে যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। যার বিষ বাষ্পে দগ্ধ হতে হচ্ছে সকলকেই। যতীন্দ্রনাথ যেনগুপ্তের নবান্ন কবিতায় যে আত্মীয়তার আবেগ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা এযুগের বাঙালি জীবনে নেই বললেই চলে। এসবের মিলিত প্রভাবেই নবান্নের জৌলুষ এযুগে কমে গিয়েছে। নবান্নকে ঘিরে বাঙালির সেদিনের আবেগ অস্তমিত প্রায়।

গ্রাম্য কৃষি মেলা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় বছরের নির্দিষ্ট সময় কৃষি মেলার আসর বসত। মূলত শীতকালে এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। অন্যান্য মেলার সঙ্গে এর আপাত কোনো বিরোধ না থাকলেও এর বিশেষত্ব হল এই মেলায় কৃষকদের আলাদা একটা পরিচিতি তৈরি হয়। বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হত সেখানে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সেরা ফসল সেখানে প্রদর্শন করত।

ফসলের গুণমান ও আকারের উপর নির্ভর করে সেরা কৃষককে পুরস্কৃত করতো মেলা কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি নতুন সারের ব্যবহার কৌশল, নিত্য নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠান থাকত মেলা প্রাঙ্গনে।

আধুনিক জীবন ব্যবস্থার দুর্নিবার পেষণে গ্রাম্য কৃষি মেলা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। আজও দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জায়গায় কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেখানে কৃষকদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। মেলার মূল ভাবনা থেকে কৃষকরা সরে গিয়েছে বা তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে জায়গা নিয়েছে বাণিজ্যিক পরিকল্পনা, অত্যাধুনিক বিনোদনের মাধ্যম। কৃষি মেলার মূল উদ্দেশ্য সেখানে পালন করা হয় না।

অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দ

হাইড্রোফোনিক চাষ (**Hydrophonic**)

এই পদ্ধতির চাষে মাটির দরকার হয় না। পুষ্টি দ্রবণে গাছের শিকড় ডুবিয়ে গাছ তৈরি করা হয়। কৃষি বিজ্ঞানী জন উডওয়ার্ড এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এক্ষেত্রে কোনো পুকুরে বা বড় পাত্রের জলে উপযুক্ত খনিজ লবণ মিশিয়ে তাতে চাষ করা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে শসা চাষ খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

এই পদ্ধতির চাষে মাটির দরকার হয় না বলে মরুভূমি বা অন্যান্য যে কোন জায়গায় চাষ করা যায়। সারের অপচয় এতে কম। নির্দিষ্ট পরিমাণে খনিজ লবণ ব্যবহার করা হয় বলে সার ও কীটনাশক থেকে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা এতে কম থাকে।

এই পদ্ধতিতে চাষের কাজে ব্যবহৃত উপকরণগুলি হল বড় জলের পাত্র বা ড্রাম, কাঠের পাটাতন, টব, বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, হাওয়া দেওয়া মোটর, পাইপ ইত্যাদি।

হাইড্রোফোনিক চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখনও বিশেষ চালু হয়নি। সাধারণত মানুষ সখের কারণে এই চাষ করছে। এই পদ্ধতিতে শসা চাষ কিছুটা ব্যবসায়িক ভিত্তি পেয়েছে। তবে তার পরিমাণও

কম। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই চাষ পদ্ধতি আরও জনপ্রিয় হবে।

S.R.I বা শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ

এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হেনরি ডি লাওলানি নামক এক ফরাসিধর্মযাজক। তিনি ১৯৬১ সালে মাডাগাস্কারে স্কুল শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় ধানের ফলন বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সালে এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন।

এই পদ্ধতির চাষে জলের ব্যবহার ও সারের ব্যবহার বিশেষ যত্ন সহকারে করা হয়। জল ও সারের অপচয় রোধে এই পদ্ধতি খুব উপকারী। সাধারণ পদ্ধতির ধান চাষে জমিতে সবসময় দুই থেকে তিন ইঞ্চি জল ধরে রাখা হয় এবং অপরিমিত পরিমাণে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষে জমিতে সবসময় জল ধরে রাখা হয় না এবং যথেচ্ছ সার ও কীটনাশকও প্রয়োগ করা হয় না। বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশকের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তবে প্রয়োগ করা হয়। ফলে অল্প ব্যয়ে অধিক ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের কিছু শব্দকথা

চারার কেক

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ করতে হলে সরাসরি মাটিতে ধানের বীজ তৈরি করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রথমে মোটা প্লাস্টিক বিছিয়ে তার উপর মাটি ছড়িয়ে তাতে বীজ তৈরি করা হয়। বীজ তৈরির পর প্লাস্টিকের উপর থেকে মাটি সমেত বীজ তুলে জমিতে রোপন করা হয়। মাটি সমেত বীজ তুললে একটি মাটির চাঙড়ে অনেক বীজ থাকে। এক একটি মাটির চাঙড়কে চারার কেক বলা হয়।

বীজ শোধন

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ করার জন্য যে ধান থেকে বীজ তৈরি করা হবে তাকে প্রথমে ভালো করে শোধন করা দরকার। এর জন্য ধান গুলোকে ট্রাইকোডারমা মিশ্রিত জলে ভেজানো হয়। যে ধান গুলো জলে ভিজে পাত্রের নীচে জমা হয় তাদের নিয়ে বীজ তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় বীজ শোধন।

জাঁক দেওয়া ও কল করা

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের বীজ তৈরি করার সময় ধান গুলোকে বীজ তৈরির আগে অঙ্কুরিত করে নিতে হয়। অঙ্কুরিত করাকে বলা হয় কল করা।

ধান অঙ্কুরিত করার জন্য ধানকে জাঁক দিতে হয়। জাঁক দেওয়ার পদ্ধতি হল কোনো ঝাঁকা বা বাজরায় ধান রেখে ধানের চারিদিক দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিয়ে কিছুদিন রেখে দেওয়া। এভাবে কিছুদিন রাখলে ধান অঙ্কুরিত হয়ে যায়।

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের উপকরণ

এটি উন্নত ধরনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধান চাষ পদ্ধতি। তাই এই চাষে আধুনিক যন্ত্র পাতি দরকার হয়। যেমন মার্কার, কোনো প্যাডি উইডার, প্লাস্টিক ইত্যাদি। সাধারণ ধান চাষে এইসব যন্ত্র বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক ছাড়া এইসব যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

বিনা কর্ষণ বা জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে ধান চাষ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কৃষিকাজের জন্য জমি চষা বা কর্ষণ করা প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঠিকঠাক ভাবে জমি চষা না হলে ফসল ভালো হয় না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কৃষকরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ষণ করে। এতে মাটির গঠন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চাষের কাজে খরচের পরিমাণও বেড়ে যায়।

এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য যতটুকু জমি কর্ষণ করার দরকার ঠিক ততটুকুই অগভীর ভাবে কর্ষণ করা হয়। অগভীর ভাবে কর্ষণ করার ফলে জমিতে জল ও সারের প্রয়োজন কম হয়। গাছের শিকড় মাটির বেশি গভীরে যেতে পারে না বলে শিকড়ের পচা রোগ কম হয়।

কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির উপর পরিবর্তিত সময় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব ঠিক কতখানি, তার স্বরূপ অন্বেষণের মাধ্যমে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছিলাম।

বিস্তৃত অন্বেষণের পর আমাদের মনে হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে কৃষি ভাষা ও সংস্কৃতিতে। একটা সময় যে কৃষকরা চাষের কাজে লাঙল, বিদেকাঠি, কোদাল ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতেই পারত না তারাই এখন ট্রাক্টরের হালখাতা করে, মেশিন দিয়ে ধান ঝাড়ে। কৃষি সংস্কৃতিতে গরু দেবতা হিসাবে পূজিত হত, এখন কৃষকরা লাঙল টানার উদ্দেশ্যে গরু পোষেই না। আবার গা ধোয়ানো জলের প্রতি অতীতের কৃষকদের ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ, এখনকার দিনের কৃষকরা বৃষ্টির জলের অপেক্ষা না করেই সেচের মাধ্যমে চাষ শুরু করে। এই রকম কৃষি পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিজ অর্থনীতিও পূর্বের অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। বেশি দামের আশায় এযুগের কৃষকরা সব্জিতে মারণ বিষ প্রয়োগ করতে পিছুপা হয় না, আবার উৎপাাদিত সব্জিতে রঙ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এসব কাজের কথা ভাবতেই পারত না আমাদের পূর্ব পুরুষেরা। এইসবের মিলিত প্রভাব পড়েছে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতিতে। দক্ষিণবঙ্গে বিগত পঞ্চাশ বছরের কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান দিনের কৃষি সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। সেদিন যে সব অনুষঙ্গ অপরিহার্য ছিল, আজ তা মূল্যহীন। আবার বর্তমানের কৃষিজ সংস্কৃতি যে আগামী দিনে অনুসৃত হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং তা না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সমাজ অর্থনীতির আরও নতুন কোনো প্রভাবে হারিয়ে যাবে বর্তমানের অতি পরিচিত প্রসঙ্গ। এইভাবে গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাবে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি ও কৃষি কেন্দ্রিক ভাষারূপ। বিবর্তনের সেই ক্রমিক ধারাপথে কিছু কৃষি সংস্কৃতি ও ভাষিক নমুনাকে ধারণ করার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।